মহাত্মা কবীর

জীবন ও দোঁহাবলী

পৃথ্বীরাজ সেন

মহাত্মা কবীর

জীবন ও দোঁহাবলি

পৃথ্বীরাজ সেন

২২/সি কলেজ রো
কলকাতা-৭০০ ০০৯

উৎসর্গ

বিদগ্ধ চিন্তক ও গবেষক সুদীপ মজুমদারকে
আন্তরিক সারস্বত অভিনন্দনে
পৃথ্বীরাজ সেন

অবতরণিকা

মধ্যযুগকে আমরা অন্ধকার যুগ বলে থাকি। অথচ এই মধ্যযুগে ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক আকাশে এমন ক—টি নক্ষত্রের উদয় হয়েছে যাঁদের আলোকপ্রভায় আজও দশ দিক উদ্ভাসিত হয়ে আছে। মধ্যযুগীয় সংস্কারে আবদ্ধ না থেকে তাঁরা স্বাধীন জীবনের জয়গান গেয়েছেন। কোনো একটি ধর্মের প্রতি অন্ধ আনুগত্য প্রদর্শন করেননি। তাঁরা চেয়েছেন পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের মনের বেদিতে যেন শুভবোধের অনির্বাণ দীপশিখা চির—প্রজ্জ্বলিত থাকে। এই তালিকাতে একদিকে আছেন অবিভক্ত বঙ্গদেশের অধ্যাত্ম যুগপুরুষ **শ্রীশ্রীচৈতন্য**। তিনি নাম, গান ও সংকীর্তনের মাধ্যমে সমাজের বুকে এক আধ্যাত্মিক সাম্যবাদের শুভ সূচনা করেন। ধনী—দরিদ্র নির্বিশেষে সকলে তাঁকে অনুকরণ এবং অনুসরণ করেছিল। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে চৈতন্যদেব বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে এক প্লাবন এনেছিলেন। বাংলার বৌদ্ধিক চেতনার আকাশকে রাঙিয়ে দিয়েছিলেন রামধনুর সাতটি রঙে।

পশ্চিম ভারতে এলেন **সাধিকা মীরাবাঈ।** কৃষ্ণপ্রেমে হলেন মাতোয়ারা। পার্থিব জীবনের সমস্ত দুঃখ—জ্বালা ও যন্ত্রণাকে দূরে সরিয়ে রেখে এমন কিছু ভজন রচনা করলেন যার অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন করে আজও আমরা অনাস্বাদিত আনন্দে প্লাবিত হই। আজও সন্ধ্যা—সমাগমে যখন ভারতের মন্দিরে মন্দিরে মীরাবাঈ—এর ভজন গীত হয়, তখন সমস্ত পরিমণ্ডল জুড়ে এক অলৌকিক চেতনার জন্ম হয়।

এই তালিকাতে আছেন **মহাত্মা নানক,** তিনি হিন্দু এবং মুসলমান ধর্মের মধ্যে সংযুক্তি স্থাপনের জন্য সারা জীবন চেষ্টা করে গেছেন। এই দুটি ধর্মের মধ্যে যেসব মহৎ বৈশিষ্ট্যগুলি লুকিয়ে আছে তাদের একত্র করে নতুন একটি ধর্মমত প্রবর্তন করেছিলেন। মহাত্মা নানকের সারা জীবনের স্বপ্ন ছিল ভারতবর্ষের বুকে যেন কোনোদিন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত না হয়!

মধ্যযুগের আর—এক মানবতাবাদী মহান সাধক হলেন **সুরদাস।** অসংখ্য ভজনের মাধ্যমে সুরদাস মানুষের মনের শুভ বোধকে জাগ্রত করার চেষ্টা করেন। আজও ভারতবর্ষের অনেক গায়ক মহা শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা সহকারে সুরদাসের ভজন পরিবেশন করেন।

মধ্যযুগের আর এক মরমীয়া সাধক—কবির নাম হল **কবীর।** কবীর তাঁর জীবনব্যাপী সাধনায় মানুষকে সেই সত্যের পথ দেখিয়েছেন, যেখানে পৌঁছোতে পারলে মানুষের জীবন—উপত্যকা সহস্র সূর্যের আলোয় আলোকিত হবে। কবীর তাঁর একাধিক দোঁহার মাধ্যমে মানুষের শুভবোধকে জাগ্রত করার চেষ্টা করে গেছেন। কালের যাত্রাপথে এই পৃথিবীর বুকে অনেক স্মরণযোগ্য পরিবর্তন ঘটে গেছে। মানুষের নৈতিকতার মান হয়েছে নিম্নগামী। মানুষ আজ বৈদ্যুতিন সভ্যতার কাছে নিজেকে বলি দিতে বাধ্য হয়েছে। তবু আজও আমরা পরম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা সহকারে কবীরের অমূল্য দোঁহাগুলি পাঠ করে থাকি। প্রতিটি দোঁহার মধ্যে যে অন্তর্নিহিত অর্থ আছে তা আমাদের হৃদয়—সরোবরে শতদলের মতো প্রস্ফুটিত হয়। যতদিন এই পৃথিবীতে মানব—সভ্যতা বর্তমান থাকবে, কবীরের মহান আকর্ষণ আমরা উপেক্ষা করতে পারব না।

গভীর পরিতাপের বিষয় বাংলা ভাষায় এখনও পর্যন্ত সেইভাবে মহাত্মা কবীর এবং তাঁর অনন্য দোঁহাগুলি সম্পর্কে কোনো প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। আপনাদের সকলের আশীর্বাদে এবং মাননীয় প্রকাশক শ্রীপ্রশান্ত চক্রবর্তীর ব্যক্তিগত উদ্যোগে আমি এই দুরূহ সারস্বত কাজে হাত দিয়েছি। যেহেতু কবীরের জীবন সম্পর্কে ইতিহাসনিষ্ঠ তথ্য পাওয়া খুব একটা সহজ নয়, তাই আমাকে অনেকাংশে জনশ্রুতির ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। কবীরের জীবনে এত বেশি ঘটনার ঘনঘটা যে, কোনটি সত্য আর কোনটি কল্পনা তা নির্ণয় করা খুব একটা সহজ নয়। তবে এর জন্য কবীরের মহান জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলি বিন্দুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

এই গ্রন্থের সবথেকে বড়ো আকর্ষণ হল কবীরের দোঁহা; তার গ্রন্থনা এবং অন্তর্নিহিত অর্থের সংযোজন। প্রতিটি দোঁহার শব্দগুলির মধ্যে যে অমৃতবার্তা লুকিয়ে আছে তা আমাদের হৃদয়কে প্রতি মুহূর্তে স্পর্শ করে। সমস্যা—বিদীর্ণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় জর্জরিত এই পৃথিবীতে নেমে আসুক চিরশান্তির বাতাবরণ। মানুষ আবার সত্য, শিব এবং সুন্দরের পূজারী হয়ে উঠুক—এটিই হল আমাদের সকলের সমবেত প্রার্থনা।

আসুন, আমরা মহাত্মা কবীরের অলৌকিক জীবন কথা শুনে নিই এবং জেনে নিই কীভাবে তিনি তাঁর অসংখ্য দোঁহার মাধ্যমে মানুষকে অন্ধকার বিবর থেকে হাজার সূর্যের আলোয় আলোকিত উপত্যকায় নিয়ে যাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন।

ধন্যবাদান্তে

পৃথ্বীরাজ সেন।

মহাত্মা কবীরের জীবন

আমাদের প্রকাশনায় লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ—

- হাজার বছরের ভারতের সাধক—সাধিকা
- ভারতের ঋষি : জীবন ও সাধনা
- শিবপুরাণ
- অষ্টাদশ পুরাণ : কাহিনি সমগ্র
- উপনিষদ গল্পসমগ্র
- বাইবেল গল্পসমগ্র
- ভারততীর্থ সমগ্র
- সিদ্ধিদাতা গণেশ
- কৃষ্ণসাধিকা মীরাবাঈ
- বাংলার মাতৃসাধনা
- লালন ফকির : জীবন ও সাধনা
- ভগিনী নিবেদিতা : জীবন ও সাধনা
- জগদগুরু শঙ্করাচার্য : জীবন ও দর্শন
- বৈষ্ণবাচার্য রামানুজ
- মহিয়সী রানী অহল্যাবাঈ

এক

এ কাহিনির সূত্রপাত আজ থেকে সাড়ে পাঁচশো বছর আগে। আমরা জানি যে—কোনো মানুষের জীবনদর্শনের ওপর সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। তাই কবীরের জীবন এবং জীবনদর্শন সম্পর্কে জানতে হলে তাঁর সময়ে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক—সাংস্কৃতিক অবস্থা কেমন ছিল সেদিকে একবার দৃষ্টিপাত করা দরকার।

তখন ভারতে চলছে পাঠান সুলতানদের শাসন। মধ্যপ্রাচ্য থেকে এই যোদ্ধা জাতি ভারতে এসে এক বিশাল ভূখণ্ডের ওপর আধিপত্য কায়েম করেছে। সুদূর আরব থেকে অনেকটা পথ পার হয়ে মানবতাবাদের ধর্ম ইসলাম ভারতের নানা প্রান্তে উড়িয়ে দিয়েছে তার জয়পতাকা। যে হিন্দুধর্মকে আমরা বিশ্বের সনাতন ধর্ম বলে থাকি, যে ধর্মের বিভিন্ন সাধকরা একসময়ে বৌদ্ধিক সাধনায় আত্মনিমগ্ন ছিলেন, সেই ধর্মে দেখা দিয়েছে অনভিপ্রেত হানাহানি। একটি সম্প্রদায়ের মানুষ অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে স্বীকার করতে পারছেন না। অন্ধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়েছে মানুষের মন। নারীর ওপর আরোপ করা হয়েছে সামাজিক বিধিনিষেধ। উচ্চবর্ণের মানুষ নিম্নবর্ণের মানুষকে নানাভাবে অত্যাচার করছেন। এই অন্তর্বিরোধ এবং সংকীর্ণতার ফলে হিন্দুধর্ম হারিয়েছে তার সুমহান গৌরব। তাই তথাকথিত অস্পৃশ্য এবং নীচ সম্প্রদায়ের মানুষ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ইসলাম ধর্মের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করছেন। এর পাশাপাশি কিছু ইসলাম শাসক বলপ্রয়োগ করে দরিদ্র হিন্দুদের ধর্মত্যাগে বাধ্য করছেন। এইভাবে হিন্দু ধর্ম তখন এক মহাসঙ্কটের মধ্যে পড়েছে। যেহেতু ইসলাম ধর্মে কোনো বর্ণভেদ বা অস্পৃশ্যতা নেই, নেই কোনো সংকীর্ণতা, তাই অনেক হিন্দু এই ধর্মের ইতিবাচক দিকগুলির প্রতি আকর্ষণ বোধ করছেন। আবার যেহেতু হিন্দুধর্মে আছে প্রবল বর্ণবিদ্বেষ, অস্পৃশ্য হবার অপরাধে অনেক মানুষকে দিন কাটাতে হয় রুদ্ধ কারার অন্তরালে, তাই দেখা দিয়েছে চাপা বিদ্রোহ, হিন্দুধর্মের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মানুষের মনে জেগেছে নানা প্রশ্ন!

ঠিক এইসময়ে এক মহাত্মা সাধকের জন্ম হয়েছিল, তিনি হলেন রামানুজ সম্প্রদায়ের মহাগুরু **বৈষ্ণব সাধক রামানন্দ।** রামানন্দ ছিলেন এক আধুনিক মনস্কতার মানুষ। বিষ্ণুর উপাসক হওয়া সত্ত্বেও রামের ভক্ত ছিলেন। রামই ছিলেন তাঁর ইষ্টদেবতা। রামকে তিনি বিষ্ণুর প্রথম এবং সাক্ষাৎ অবতার বলে বিশ্বাস করতেন। রামানন্দের গ্রহণযোগ্যতা তখন এক অবিশ্বাস্য পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। অসংখ্য মানুষ তাঁকে অনুসরণ করতেন। তাঁর মুখনিঃসৃত অমৃতবাণী শ্রবণ করার জন্য মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা থাকতেন অপেক্ষাতে। এই রামানন্দ একদিন ঘুরতে ঘুরতে এলেন কাশী শহরে। তাঁকে দেখার জন্য মানুষজনের মধ্যে তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি হল।

সব সময় রামানন্দ এক ভাবোন্মাদ অবস্থায় থাকতেন। তাঁকে দেখে মনে হত তিনি বোধহয় এই পৃথিবীর বাসিন্দা নন। তাঁর মন কোনো মহাকাশে হারিয়ে গেছে। রামানন্দ অস্পৃশ্যতা মানতেন না। প্রতিটি মানুষকে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রতিভূ বলে শ্রদ্ধা করতেন। রামানন্দ অনেক তথাকথিত নীচ মানুষকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। আর সেইজন্য তখনকার দিনের প্রাচীন মনোভাবাপন্ন সমাজপতিরা রামানন্দকে সহ্য করতে পারতেন না। তাঁদের চোখে রামানন্দ ছিলেন এক জীবন্ত বিস্ময়!

নিশান্তিকার আলোয় রাঙা পৃথিবীতে রামানন্দ ঘুম থেকে উঠতেন। পুণ্যতোয়া জাহ্নবীতে গিয়ে অবগাহন করতেন। গতদিনের শত অপবিত্রতাকে দূর করে দিতেন। তারপর ঘাটে বসে করতেন রামনাম সংকীর্তন। দেখতে দেখতে অসংখ্য মানুষ এসে তাঁর চারপাশে ভিড় করত। সেদিনও রামানন্দ তাঁর দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ শুরু করেছেন। আবেগে আপ্লুত হয়ে রামনাম সংকীর্তন করছেন। এইসময় এক ব্রাহ্মণ শিষ্য এসে পরম ভক্তিভরে গুরু রামানন্দকে প্রণাম করলেন। তারপর তাঁর পাশে এসে বসলেন। অবাক বিস্ময়ে শ্রবণ করতে লাগলেন তাঁর মুখনিঃসৃত রামনাম সংকীর্তন। সেই ব্রাহ্মণ শিষ্যের সঙ্গে তাঁর বাল্যবিধবা কন্যাটিও সেদিন গঙ্গার তীরে এসেছিল। পিতাকে অনুসরণ করে সে—ও পরম শ্রদ্ধা—ভক্তি ভরে গুরু রামানন্দকে প্রণাম

করে। ক্ষণকালের জন্য ফেলে আসা দিনযাপনের শোকবিহ্বল মুহূর্তগুলির কথা মনে পড়ে যায় ওই কন্যার। এই বয়সেই তাকে কিনা স্বামীহারা হতে হয়েছে। তখনকার সমাজে বিধবাদের স্থান ছিল অন্ধকারের অভ্যন্তরে। কোনো সামাজিক কাজে তাদের স্বীকৃতি দেওয়া হত না। বলা হয় তারা সারাজীবন অভিশপ্ত হয়েই দিন কাটাবে। বেচারি কন্যা, তাকেও এইভাবে সকলের লাঞ্ছনা এবং গঞ্জনা সহ্য করতে হয়।

রামানন্দ এতক্ষণ রামনামে বিভোর ছিলেন। যখন তিনি রামনাম করেন, তখন তাঁর বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয়। এবার তিনি পার্থিব জগতে ফিরে এলেন। চোখ দুটি খুললেন। চোখের সামনে উপবিষ্টা সেই ব্রাহ্মণ কন্যাকে দেখে তাঁর সমস্ত অন্তর কেমন যেন আলোড়িত হল। তিনি আশীর্বাদ করে বললেন—'আমি আশীর্বাদ করছি মা, অচিরেই তুমি পুত্রবতী হবে।'

গুরু রামানন্দের মুখ থেকে এই বাক্যগুলি উৎসারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্রাহ্মণ শিষ্যের মনে হল সেখানে ভূকম্পন শুরু হয়েছে। তাঁর কন্যা যে বাল্যবিধবা তা হয়তো আত্মমগ্ন গুরু রামানন্দ লক্ষ করেননি। এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বেচারি মেয়েটির মনে হল কে যেন এক লহমায় তার হৃদস্পন্দন স্তব্ধ করে দিয়েছে। ভয়ে বিস্ময়ে সে হয়ে গেল বাকহারা! তারপর দুজনেই কেঁদে লুটিয়ে পড়ল গুরুর পায়ে। তারা জানে সিদ্ধ সাধক মুখ দিয়ে যে কথা একবার উচ্চারণ করেন, সেকথা সত্য হবেই। কেউ তার সামনে প্রতিবন্ধকতার প্রাচীর তৈরি করতে পারবে না।

সবকথা শোনার পর গুরু বললেন, আমি আশীর্বাদ করছি, এই পুত্র লাভে তোমার কোনো কলঙ্ক হবে না। পুরুষ সংসর্গ ছাড়াই তুমি এমন এক পুত্র সন্তানের জননী হবে যে হবে মনের ত্রাতা। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি জগতের পরিত্রাণের জন্য এক মহাপুরুষ তোমার গর্ভে পুত্ররূপে আসবেন। তিনি প্রসূত হবেন অলৌকিকভাবে। অযোনি সম্ভূত সেই সন্তান মায়ের তালু থেকে ভূমিষ্ঠ হবে।

এই কথা শোনার পর ব্রাহ্মণ শিষ্যের মনে এক আশ্চর্য শিহরণের জন্ম হয়েছিল। দেখতে দেখতে দিন কেটে যায়। অবশেষে একদিন সত্যি সত্যি এক দেবশিশুকে প্রসব করে ওই অভিশপ্ত কন্যা। বিধবার সন্তান প্রসব—এই ব্যাপারটি নিয়ে সমাজে সৃষ্টি হবে দারুণ আলোড়ন! তারা জানে যে এর জন্য তাদের সমাজ থেকে বিতাড়িত হতে হবে। সেই মুহূর্তে আর গুরু রামানন্দের আদেশের কথা মনে পড়েনি ওই ব্রাহ্মণ শিষ্যের, তিনি ভাবলেন অচিরেই এই পুত্র সন্তানটিকে বিদায় করতে হবে। কিন্তু একে হত্যা করা উচিত হবে না, একে কোনো এক জায়গায় রেখে আসতে হবে। কিন্তু কোথায় আছে এমন একটি নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তাপূর্ণ স্থান?

তখন কাশীর একটি পল্লি অঞ্চলে ছিল 'লহর তালাও' নামে একটি পদ্মপুকুর। সেখানে থরে থরে পদ্মফুল ফুটে থাকত। ভারি সুন্দর সেই অঞ্চলটি। মনে হত সেটি বুঝি প্রকৃতির এক খেয়ালি খেলাঘর। সদ্য—মাতা সেই বিধবা কন্যা শেষবারের মতো তাকাল তার নবজাত পুত্রটির মুখের দিকে। হু—হু করে উঠল মায়ের সমস্ত অন্তর। সে ভাবল এই জীবনে আর কখনো সন্তানের সঙ্গে দেখা হবে না তার। কিন্তু কী আর করা যায়? সমস্ত দিন অতিবাহিত করতে হবে ভয়ে ভয়ে। রাতের অন্ধকার নেমে এলে সে ওই নবজাতককে নিয়ে পৌঁছে যাবে পদ্মপুকুরের পাশে। দেখতে দেখতে সূর্য গেল অস্তাচলে। শেষ রশ্মির আলোকছটায় আলোকিত হয়ে উঠল সাঁঝের আকাশ। মেয়েটি এতক্ষণ আগলে বসেছিল। এবার সকল বন্ধন ছিন্ন করতে হবে। রাতের অন্ধকার ঘনীভূত হবার সঙ্গে সঙ্গে সে এক—পা এক—পা করে ওই শিশুটিকে নিয়ে পৌঁছে গেল পুকুরপাড়ে। এক রাশ পদ্মের মাঝে নবজাতককে শুইয়ে দিয়ে চলে এল। এতক্ষণ পর্যন্ত অবরুদ্ধ যে কান্না তার বুকের খাঁচায় বন্দি ছিল, এখন তা নীল আসমানে উড়ে যাওয়া পাখির মতো বেরিয়ে এল। সে তখন পুকুরের ধারের এক দেব মন্দিরে পৌঁছে গেল। বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে ক্রন্দনরত সুরে বলল—হে ঈশ্বর, তুমি তো জগৎ সংসারের সবকিছুর ত্রাতা। তুমি তো আমার অন্তরের বেদনা শুনতে পাচ্ছ। ঠাকুর, আমি লোকলজ্জার ভয়ে আমার শিশুপুত্রটিকে লালন—পালন করতে পারলাম না। এজন্য আমি যে কতখানি

শোকাভিভূত, আশা করি তা আর খুলে বলতে হবে না তোমাকে। তুমি একে রক্ষা কোরো। আমার পাপ তুমি ক্ষমা করে দাও।

এই কথা বলে কোনোদিকে দিকপাত না করে মাথা নীচু করে কিশোরী কন্যা ফিরে এল তার গাঁয়ে। সমস্ত রাত তার চোখের তারায় ঘুম ছিল না। নাক্ষত্রিক আকাশের দিকে তাকিয়ে সে বার বার তার শিশুপুত্রের কথাই ভেবেছে। তারপর কখন ভোররাতে ঘুমিয়ে পড়েছে বেচারি কন্যা, সে খবর হয়তো আমাদের জানা নেই।

দুই

কাছাকাছি একটি গ্রামে বাস করত নীরু জোলা আর তার স্ত্রী নীমা। গরিব মুসলমান পরিবার। ধর্মভীরু, সৎ, শোভন পথে হাঁটতে চায়। তাঁত বুনে কোনোরকমে জীবিকা নির্বাহ করে। তাদের খুবই ইচ্ছে ঘরে একটি কন্যা অথবা পুত্রসন্তান আসবে। কিন্তু কিছুতেই সেই সাধপূরণ আর হয়নি। সংসারটা বড়ো বেশি ফাঁকা বলে মনে হয় তাদের কাছে। নীরুর স্ত্রী নীমা পদ্ম তুলে বাজারে বিক্রি করে। যেহেতু কাশীতে দেবদেবীর অনেকগুলি মন্দির আছে তাই পদ্মের চাহিদা কখনো কমে না। পদ্ম বিক্রি করে কিছু পয়সা পায় সে। তাই দিয়ে কোনোমতে দু—বেলা দু—মুঠো অন্নের সংস্থান করে।

প্রতিদিনের মতো নীমা সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে গেছে সেই পদ্মপুকুরে। এক মনে পদ্ম সংগ্রহ করছে সে। তারই পাশে একটি পদ্মের ওপর শুয়েছিল ওই সদ্যজাত শিশুটি। ঘুমিয়ে পড়েছিল বেচারি। হঠাৎ একটি পোকা কামড়ে দেয় শিশুটিকে। তীব্রভাবে কেঁদে ওঠে সে। সেই কান্নার শব্দ পৌঁছে যায় নীমার কানে। নীমা ছুটে আসে। চোখের সামনে এমন অভাবিত ঘটনা দেখে শিহরিত হয়ে ওঠে তার সমস্ত শরীর। সে মনে মনে আল্লাহর কাছে উমেদাদ করে বলে, 'হে আল্লাহ, তোমার আশীষে আমি একটি পুত্র সন্তানকে পেয়েছি। আহা, কেউ যেন একে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে না যায়।'

সুন্দর, ফুটফুটে, অসহায় ওই শিশুটিকে দেখে নীমার মাতৃত্ববোধ উথলে ওঠে। এতদিন ধরে যে অবদমিত আশা তার মনের বিবরে কেঁদে মরছিল, এখন বুঝি তা পরিপূর্ণ হয়। ঘরে গেল সে। স্বামী নীরুকে সব কথা খুলে বলল। নীরু লোকলজ্জার ভয়ে আপত্তি তুলেছিল। শেষপর্যন্ত মাতৃস্নেহের কাছে পরাস্ত হল সে। আহা, এমন দেবশিশু, কোন সে হৃদয়হীন মা একে পদ্মবনে ফেলে দিয়ে গেছে?

তবু সব কথা চিন্তাভাবনা করতে হবে বৈকি।

নীরু শেষ প্রতিরোধের প্রাচীর তুলে বলে—শোনো, যদি কেউ এসে দাবি করে তখন কী হবে?

কথাটা শুনে কেমন যেন হয়ে যায় নীমা। এতক্ষণ তার মুখে ছিল আশার আলো, এখন সেখানে সহসা নিরাশার ঘন অন্ধকার। তবুও মনকে প্রবোধ দিয়ে সে আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলে—আমরা তো একে চুরি করে আনি নি। স্বয়ং আল্লাহ শিশুটিকে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। তিনি হলেন পরম করুণাময়। তাঁর লীলা বোঝা আমাদের কর্ম নয়। শিশুটিকে না দেখতে পেলে এ কী আর বেঁচে থাকত?

এইভাবেই সেই ছোট্ট শিশু নতুন মা এবং বাবার সন্ধান পেল। কে জানে, এই ভাবেই বোধহয় পৃথিবীর ইতিহাসে নানা আশ্চর্য ঘটনা ঘটে যায়—বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা হয় না!

তিন

রামানন্দের সেই ব্রাহ্মণ শিষ্য ইতিমধ্যেই মেয়েকে নিয়ে কাশী ত্যাগ করে অন্য কোথাও চলে গেছেন। কাশীর পরিবেশ আর ভালো লাগল না তার। সব সময় চোখের সামনে শোকাভিভূতা মেয়ের মুখখানি দেখেন তিনি। কৃতকর্মের জন্য মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। আর ওদিকে মুসলমান জোলার ঘরে ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে ওই শিশুটি।

একদিন নীরু আর নীমা এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখল। দেখল ওই শিশুটি এক দিব্য জ্যোতির্ময় পুরুষে পরিণত হয়েছে। সে বলছে গত জন্মে তোমরা আমাকে অনেক সেবা করেছিলে। তাই আমি এবার এসেছি তোমাদের

ঘরে তোমাদের ছেলে হয়ে। আমি এবার তোমাদের মোক্ষলাভের ব্যবস্থা করব। আর পার্থিব কষ্ট ভোগ করতে হবে না তোমাদের।

এই হল মহাত্মা কবীরের জন্ম কাহিনি। তবে অনেক ভাষ্যকার আবার একটু অন্যভাবে এ কথা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মহাত্মা কবীর যে মুসলমান জোলা পরিবারেই মানুষ হয়েছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

এবার আমরা আর—একটি কাহিনি শুনে নেব। সেখানে লেখা আছে, একদিন গুরু রামানন্দের শিষ্য গোঁসাই অষ্টানন্দ দেখলেন যে, আকাশ থেকে এক দিব্যজ্যোতি ধীরে ধীরে নীচের দিকে নেমে আসছে। সেই জ্যোতি ওই লহর তালাও—তে মিলিয়ে গেল। সেই জ্যোতিতে চারপাশ হয়ে উঠল আলোকিত। চোখের সামনে এমন অভাবিত ঘটনা দেখে অষ্টানন্দ একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। ক্ষণকালের জন্য তাঁর মনে হল, কে বুঝি তাঁর হৃদস্পন্দন স্তব্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেবের কাছে গিয়ে সব ঘটনা খুলে বললেন। সব শুনে রামানন্দ বললেন—এই আলোক সাধারণ কোনো আলো নয়। কোনো এক মহাপুরুষের আত্মা ওই দিব্যজ্যোতি রূপ ধারণ করেছে। সেই আত্মা অতি শীঘ্রই মর্ত্যলোকে এক মানবশিশু হিসাবে জন্ম নেবেন। তারপর রামানন্দ ধ্যানযোগে বুঝতে পারলেন যে, লহর তালাও পদ্মবনে এক দৈবশিশু শুয়ে আছেন। এই শিশুর শরীর থেকে উদ্ভাসিত আলোক রেখায় চারপাশ এমন আলোকিত হয়ে উঠেছে।

এই গল্পের বাকি অংশ আগে বর্ণিত ঘটনার মতো একেবারেই একরকম। এবার আমরা আবার প্রথম কাহিনিতে ফিরে যাই। স্বপ্ন ভেঙে গেল নীরু আর নীমার। তারা বুঝতে পারল যে এই শিশুটির মধ্যে অলৌকিক এক ক্ষমতা লুকিয়ে আছে। পরম আদরের সঙ্গে তাকে লালন—পালন করতে থাকল জোলা দম্পতি।

এবার শিশুটির নামকরণ করতে হবে। মুসলমানদের প্রচলিত প্রথা অনুসারে একজন কাজি এসে নামকরণ করেন। কাজিসাহেব এসে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরান খুললেন। যে নাম শিশুর রাখা হবে সেই নামের যেন উল্লেখ থাকে ওই কোরানে। তখন এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল। ধর্মপ্রাণ কাজিসাহেব সভায় দুঃখ করলেন যে, কোরানের যে পাতাই তিনি বের করছেন সেখানে কবীর, আকবর, কিবরা, কিবকিয়া ছাড়া আর কোনো নামের উল্লেখ নেই। এই চারটি নামের অর্থই এক। এই শব্দগুলির অর্থ হল ঈশ্বর অর্থাৎ আল্লা এবং অন্য অর্থ হল মহৎ।

চোখের সামনে এমন অভাবিত ঘটনা ঘটতে দেখে বৃদ্ধ কাজিসাহেব খুবই অবাক হয়ে গেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে এই শিশুটির মধ্যে এক আশ্চর্য ঐশী শক্তি লুকিয়ে আছে। আবার তিনি কোরানের পাতাগুলি ওলটালেন। কি আশ্চর্য, চারটি নামই বারবার ভেসে উঠছে। দীর্ঘদিন ধরে এই পদে তিনি আসীন আছেন। এর আগে তিনি কত শিশুর নামকরণ করেছেন। কিন্তু কখনো তাঁকে এমন অবস্থার সামনে পড়তে হয়নি। যে নাম ঈশ্বরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সেই নাম কী কোনো মানুষের ক্ষেত্রে রাখা যায়?

কাজিসাহেব এই ঘটনায় অত্যন্ত বিব্রত হয়েছিলেন। তিনি শিশুর নামকরণ না করে বিরক্ত হয়ে সেই স্থান পরিত্যাগ করলেন। এই ঘটনার কথা ধীরে ধীরে গ্রামের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। এই কথা শুনে অন্যান্য কাজিরা এলেন নীরু জোলার বাড়িতে। তাঁরাও কোরানের পাতা খুলে উপযুক্ত নাম বাছতে থাকলেন। তাঁদের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে গেল। তাঁদের চোখও কোরানের সমস্ত পাতাতেই সেই চারটি নামই মাত্র দেখতে পেল। আগের কাজির মতো এই কাজিরাও এমন ঘটনা দেখে খুবই অবাক হলেন। তাঁরা ভাবলেন ওই শিশুটির মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু অশুভ লক্ষণ লুকিয়ে আছে। তাঁদের কেউ কেউ আবার সন্দেহ প্রকাশ করে বললেন যে, এই শিশুটিকে বাঁচিয়ে রাখা উচিত হবে না। কারণ বড় হলে এই শিশুটি নিজেকে আল্লার প্রতিস্পর্ধী হিসাবে ঘোষণা করবে। হয়তো ইসলাম ধর্মকে বিপন্ন করার চেষ্টা করবে। ধর্মকে বাঁচাতে হলে এই শিশুকে অবিলম্বে বিনাশ করা উচিত।

কাজিরা নীরুকে ডেকে ভালো করে এই কথাটা বুঝিয়ে দিলেন। কাজিরা বললেন, আমাদের জীবনের চেয়েও ধর্ম অনেক বড়ো। ধর্মকে বাঁচাতে হলে এই শিশুকে অবিলম্বে বলি দিতে হবে। তাতে তুমি স্বর্গ লাভ করবে।

নীরু ছিল এক অশিক্ষিত ও সহজ সরল স্বভাবের মানুষ। তার মনেও ছিল ধর্মের প্রতি গোঁড়া ভাব। নিজের কোনো বিচারবুদ্ধি তার ছিল না। সে কাজিদের কথাকেই অভ্রান্ত বলে মেনে নিল। সঙ্গে সঙ্গে নীরু একটি ছোরা নিয়ে এসে শিশুর বুকে বসিয়ে দিল। যে নীমা মাতৃস্নেহে শিশুটিকে বড়ো করে তুলেছিল, সে—ও মুখ বন্ধ করে থাকতে বাধ্য হল। এতদিন পর্যন্ত ওই শিশুটির ওপর তার অপত্য স্নেহ শ্রাবণ—বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ছিল, কিন্তু তা বলে তো সে আর অধর্মের কাজ করতে পারে না!

কিন্তু সেখানেও এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেল। নীরু তার গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে ছুরিটা শিশুর দেহে বসিয়ে দিয়েছে, কিন্তু তাতে শিশুর কিছুই হল না। সামান্যতম ক্ষতেরও সৃষ্টি হল না তার ছোট্ট কোমল দেহে। এক ফোঁটা রক্তও নির্গত হল না। এমন ঘটনা দেখে উপস্থিত সকলে আরও একবার অবাক হয়ে গেল।

সকলকে অবাক করে দিয়ে সেই শিশু উচ্চারণ করল এক দোঁহা, যে দোঁহা শুধুমাত্র কোনো প্রাজ্ঞ ধর্মগুরুই বলতে পারেন। সেই দোঁহার অর্থ হল রক্ত মাংস দিয়ে গড়া নয় আমার এই দেহ, এ হচ্ছে বিশুদ্ধ আলো।

উপস্থিত কাজিরা এমন ঘটনা দেখে আরও একবার হতবাক হয়ে গেলেন। তাঁদের সমস্ত বিচারবুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়ে গেল। তাঁরা বুঝতে পারলেন এই শিশুটিকে কোনোভাবে হত্যা করা সম্ভব নয়। এক ঐশ্বরিক শক্তি সর্বদা তাকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে। এই শিশুটির মধ্যে লুকিয়ে আছেন ভবিষ্যতের এক মহাপুরুষ। হয়তো স্বয়ং আল্লা কোনো এক নির্দিষ্ট কাজের দায়িত্ব দিয়ে তাকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তখন সব কাজিরা একযোগে এই শিশুটির নামকরণ করলেন কবীর!

চার

আমরা আগেই বলেছি একজন মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তার পরিবেশ এবং পরিমণ্ডলের ওপর নির্ভর করে। কবীরের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কবীর মুসলমান জোলা পরিবারে বড়ো হয়ে ওঠেন। এই জোলা সম্প্রদায়ের একটি আলাদা নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আছে। তাঁরা হলেন নাথ সম্প্রদায়ের যোগী। একসময় নাথ শাসিত পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম উত্তরপ্রদেশের এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে আধিপত্য বিস্তার করে। ব্রাহ্মণরা সমাজপতির আসনে আসীন হন। তাঁরা অনেক সময় ভূখণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়দের প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠেন। যেহেতু সাধারণ মানুষের চোখে ব্রাহ্মণরা ছিলেন ঈশ্বরের প্রতিভূ, তাই তাঁরা একটি ভূখণ্ড শাসন করতে গিয়ে অতিরিক্ত ক্ষমতার অধিকারী হন। পরবর্তীকালে তাঁরা সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষদের ওপর ধারাবাহিক অত্যাচার চালাতে শুরু করেন। তখন হিন্দুধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে অনেক মানুষ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হন। মুসলমান শাসকরা উত্তর—ভারতের এক বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডের ওপর তাঁদের আধিপত্য কায়েম করেছেন। এই সময়ে নাথ সম্প্রদায়ের জোলারা বাধ্য হয়ে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের সংস্কৃতির মধ্যে হিন্দু—মুসলমানের দ্বৈত—চেতনা প্রবাহিত ছিল। তাঁরা তাঁদের মনন এবং মানসিকতা থেকে হিন্দুধর্মের বিষয়গুলিকে একেবারে লুপ্ত করতে পারেননি। আবার মুসলমান ধর্মের নানা ইতিবাচক দিক তাঁদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

নাথ সম্প্রদায়ের মানুষেরা বেদ, ব্রাহ্মণ, বর্ণাশ্রম, অস্পৃশ্যতা, পৌরাণিক শাস্ত্রাচার প্রভৃতি মানতেন না। কিন্তু তাঁরা ব্রহ্মকে মানতেন। তাঁরা ছিলেন নিরাকার ধর্মের উপাসক। নাথ ধর্মের মহাসাধকেরা তাঁদের জীবনব্যাপী সাধনার মাধ্যমে বলেছেন যে উপযুক্ত এবং ধারাবাহিক যোগ্য সাধনার মাধ্যমেই একজন মানুষ তার ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছোতে পারবে। তখন জীবন্মুক্তি ঘটে যাবে এবং সেই মানুষকে আর মনুষ্যদেহ গ্রহণ করার জন্য পৃথিবীতে আসতে হবে না। এই কাজে সিদ্ধিলাভ করার জন্য নাথ সাধকেরা হঠযোগের সাধনাও করতেন।

নাথ সম্প্রদায়ের মানুষেরা মুসলমান হলেন, কিন্তু সামাজিক প্রভাব বা প্রতিপত্তি কিছুই পেলেন না। আগের মতোই তাঁত বুনে কোনোরকমে কায়ক্লেশে জীবিকা নির্বাহ করতে থাকলেন। তাঁদের দৈনন্দিন আচার আচরণের মধ্যে হিন্দুধর্মের অনেক বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হত। কবীর যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই পরিবার দু—পুরুষ আগে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাই এই পরিবারের সদস্যরা দুটি পরিবারের সাধনাকেই মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে ভারত—সংস্কৃতির দুটি ধারাকে একীভূত করতে না পারলে ভারতীয়ত্ব বোধের জাগরণ সম্ভব হবে না।

এমনই এক অসাম্প্রদায়িক পরিবেশের মধ্যে কবীর বেড়ে ওঠেন। যেহেতু তাঁর সংসারে ছিল দারিদ্রের অভিশাপ তাই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের সুযোগ তাঁর হয়নি। ছোটোবেলা থেকেই তাঁকে বাধ্য হয়ে তাঁত ব্যবসা শিখতে হয়। কিন্তু সেদিনের বালক কবীরের মন সদাসর্বদা ঈশ্বর—চেতনায় মগ্ন থাকত। তাঁত চালাতে চালাতে তিনি অবাক বিস্ময়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। মাঝে মাঝে কোনো বন্ধুর কাছে গিয়ে একটি কঠিন প্রশ্ন করতেন। পালক পিতাকে সাহায্য করার জন্য তাঁকে বাধ্য হয়ে তাঁত চালাতে হত। কিন্তু এই কাজে তিনি তাঁর মনপ্রাণ সমর্পণ করতে পারতেন না। কোনো তাৎক্ষণিক সুখ তাঁকে বিন্দুমাত্র আকৃষ্ট করতে পারত না। তাঁকে দেখে মনে হত তিনি বোধহয় এক ভাবরাজ্যে বিচরণ করছেন। সমবয়সি সঙ্গীসাথিদের সঙ্গে মিলে কোনো বিনোদনী কৌতুকে কখনো অংশ নিতেন না। বালক বয়স থেকেই কবীর ছিলেন অত্যন্ত গম্ভীর স্বভাবের।

তখন কাশীতে প্রায় রোজই একাধিক ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হত। কবীর সময় এবং সুযোগ পেলেই এইসব ধর্মসভায় উপস্থিত হতেন। সেখানে ধর্মের প্রবক্তারা জ্ঞানগম্ভীর ভাষণের মাধ্যমে দর্শক এবং শ্রোতৃমণ্ডলীকে উদ্বুদ্ধ করতেন। অনেক সময় বিতর্কের আসর বসতো। একজন প্রবীণ বক্তা অন্য এক বক্তার যুক্তিগুলি খণ্ডন করার চেষ্টা করতেন। কবীরের কাছে এই জাতীয় তর্ক—বিতর্কের আসর ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। তিনি এইসব আসরে গিয়ে হিন্দুধর্মের নানা তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত হতেন। আবার কখনো কখনো তিনি মুসলমান ধর্মসভাতেও যেতেন। মৌলবীরা কণ্ঠমাধুর্যের সাহায্যে কোরানের এক—একটি পদ বর্ণনা করতেন। কবীর তন্ময় হয়ে এই বর্ণনাগুলি শুনতেন। কিশোর বয়স থেকেই কোনো ধর্মের প্রতি তিনি বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ পোষণ করেননি। যেহেতু তাঁর রক্তে নাথ ধর্মের প্রভাব ছিল তাই কৈশোরে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে কবীর যোগবিদ্যার প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ করতে থাকেন।

যদিও তিনি সেভাবে শিক্ষিত হবার সুযোগ পাননি কিন্তু পরিদৃশ্যমান, পৃথিবীর নানা ঘটনাবলি সম্পর্কে ছিল তাঁর তীব্র জিজ্ঞাসা। তিনি সত্যকে উপলব্ধি করতে পারতেন। ধর্মের যে—কোনো দুরূহ আলোচনা একবার শোনার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিটি অক্ষর মনে রাখতে পারতেন। গ্রামবাসীরা কিশোর কবীরের এই আশ্চর্য ক্ষমতা দেখে একেবারে অবাক হয়ে যেতেন। অনেকে তখনই মন্তব্য করেছিলেন যে, কবীর একজন বিশিষ্ট সাধকে পরিণত হবেন।

কবীর কোনো জায়গায় গিয়ে ঈশ্বর সম্পর্কে আলোচনায় অংশ নিতেন। এই বয়সে তাঁর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের তীব্রতা দেখে জনমণ্ডলী একেবারে অবাক হয়ে যেত। ধর্ম আলোচনায় যোগ দেবার সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু ভুলে যেতেন কিশোর কবীর। তাঁর ওপর যে একটি গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে সেকথা তাঁর বিন্দুমাত্র মনে থাকত না। অনেকে কবীরের বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ করতেন। অনেকে আবার কবীরকে অলস, অকর্মণ্য বলে বিদ্রূপ করতেন। এইসব কথা তাঁর পালিত মা—বাবা নীরু ও নীমার কাছে পৌঁছে যেত। পালিত পুত্রের এহেন আচরণে তাঁরা খুবই কষ্ট পেতেন। তাঁরা জানতেন যে কবীরের মধ্যে এক আশ্চর্য ক্ষমতা লুকিয়ে আছে। কবীর তাঁদের কাছে ছিলেন ঈশ্বরের অবদান। কিন্তু কিশোর কবীরের এই ধরনের বৈরাগ্য দেখে তাঁরা মনে মনে খুবই দুঃখ পেতেন। কবীরের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খুবই চিন্তা করতেন তাঁরা। অনেকে এসে নানা পরামর্শ দিতেন। অনেকে বলতেন কবীরকে এবার দেখেশুনে একটা বিয়ে দিলেই এই উন্মনা ভাব সেরে যাবে।

কিন্তু কবীরের কাছে এই প্রস্তাব তুলতেই তিনি তা নাকচ করার চেষ্টা করতেন। তিনি বলতেন যে ঈশ্বরকে লাভ করাই হল তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। তিনি ঈশ্বর চিন্তার মাধ্যমেই জীবনের প্রতিটি প্রহর কাটিয়ে দেবেন। তাই সংসারের বন্ধনে নিজেকে বন্দি করবেন না।

কবীরের কথার মধ্যে যুক্তি ছিল। এই যুক্তি খণ্ডন করতে পারেননি তাঁর পাড়া প্রতিবেশীরা। অবশেষে এগিয়ে এলেন এক বয়স্ক ভদ্রলোক।

তিনি কবীরকে নানাভাবে বোঝাতে শুরু করলেন। সেই ভদ্রলোক বুঝিয়েছিলেন যে, যদি আমরা সৎ এবং নির্ভীক থাকি তাহলে সিদ্ধিলাভ হবেই। এই পৃথিবীতে এমন অনেক সংসারী মানুষকে দেখতে পাওয়া যায় যাঁরা তাঁদের সততা, ভক্তি এবং নিষ্ঠার দ্বারা ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করেছেন। এর জন্য বিয়ে করা অথবা অবিবাহিত থাকা, দুটোই সমান। কবীর যদি সৎ এবং নিষ্ঠাবান হন, তাহলে ঈশ্বরের সান্নিধ্য অবশ্যই লাভ করবেন।

এতদিন পর্যন্ত কবীর গভীরভাবে বিবাহ সংক্রান্ত যে—কোনো আবেদনকে নাকচ করেছেন। সারাজীবন কঠিন কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এখন এসব কথা শুনে কবীর বুঝতে পারলেন যে পালক পিতা—মাতার মনে শান্তি দিতে হলে তাঁকে বিয়ে করতেই হবে। এই পালক পিতামাতা না থাকলে কবীরের পক্ষে জীবনধারণ করা কী সম্ভব হত?

অনেক ভাবনাচিন্তা করার পর কবীর লুই নামের এক মুসলমান কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। বিয়ের পরেও তাঁর মানসিকতার ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হল না। আগের মতোই এক মুসাফির হয়ে এক আলোচনা সভা থেকে অন্য আলোচনা সভায় চলে যাচ্ছেন। কোথাও একজন যোগীপুরুষ এসেছেন এই খবর পেলে সঙ্গে সঙ্গে সেই মহাত্মা পুরুষের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন কবীর। তরুণ সাধক হিসাবে কবীরের নাম তখন চারপাশের অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। অনেকে কবীরের সঙ্গে কথা বলার জন্য অপেক্ষায় থাকতেন। অনেকে কবীরকে তাঁর ইহজীবনের গুরু বলে মেনে নিয়েছিলেন। অনেকে চলতি পথে কবীরকে দেখে তাঁর মুখ থেকে ধর্মের আলোচনা শুনতে চাইতেন। কবীর কিন্তু অতি শান্তভাবে সকলের প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করতেন। এতেই প্রমাণিত হয় যে তিনি কত বড়ো মাপের সাধক ছিলেন।

হিন্দু ধর্ম এবং ইসলাম ধর্মের পারস্পরিক আলোচনা কবীরকে আরও প্রাজ্ঞ এবং ঋদ্ধ করে তোলে। কবীর বুঝতে পেরেছিলেন যে, কাজি এবং মৌলবীরা নানাভাবে দরিদ্র মুসলমানদের ঠকিয়ে চলেছেন। অশিক্ষিত সাধারণ মানুষের কাছে তাঁরা ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা তুলে দিচ্ছেন। ধর্মকে আরও জটিল করে তুলছেন যাতে সাধারণ জনমানসে তাঁদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ থাকে।

হিন্দু সমাজেও এমন কিছু পুরোহিতের দেখা মেলে যাঁরা অযথা ধর্মের বিষয়টিকে জটিল করে তুলতেন। কবীর হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেই কড়া সমালোচনা করতে শুরু করলেন। তাঁর লেখনীর মধ্যে এমন এক অগ্নি আবেশ ছিল যা সকলকে ভাবিয়ে তুললো। কবীর চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের বুকে হিন্দু এবং মুসলমান যেন সম্প্রীতির বাতাবরণ রক্ষা করে বসবাস করতে পারেন। এই কাজে তিনি জীবনের অনেকগুলি রক্তিম প্রহরকে উৎসর্গ করেছিলেন। বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে ঘুরে হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষকে সাবধান করে দিলেন। তাদের কাছে কবীরের আহ্বান ছিল কেউ যেন কবীরকে গুরু বলে না মানে। কারণ গুরু হওয়া অত সহজ কাজ নয়। এই বিষয়ে একটি দোঁহায় কবীর তাঁর মনের ভাব পরিষ্কারভাবে বললেন—

সাধো, সো সতগুরু মোহিঁ ভাবৈ।
মত্ত প্রেমকা ভর ভর প্যালা।
আপ পিঠৈ মাহি প্যাবৈ।
পরদা দূর করৈ আখিলকা,
ব্রহ্ম-দরশ দিখলাবৈ।

জিস দরশমে সব লোক দরশৈ,
অনহদ শব্দ শুনাবৈ।
একহি সব সুখ দুঃখ দিখলাবৈ,
শব্দ মেঁ সুরত সমাবৈ,
কহৈঁ কবীর তাকো ভয় নাহীঁ,
নির্ভর পদ পরমাবৈ।

সাধু, সেই সৎগুরুকে আমার ভালো লাগে যিনি সাচ্চা প্রেমের পেয়ালা ভরে নিজে পান করেন আর আমাকেও পান করান। যিনি চোখের পর্দা ঘুচিয়ে দিয়ে ব্রহ্ম দর্শন করান। যে ব্রহ্মদর্শনের রূপ রূপান্তর দেখা যায়, অনাহত শব্দ শোনা যায়, সেই দর্শন লাভ করে আমি অনাস্বাদিত আনন্দ পেয়েছি। শব্দ ও ব্রহ্মের মধ্যে যে চেতনা লুকিয়ে আছে, তার প্রকাশ দরকার। কবীর বলছেন সেই সৎগুরুর কোনো ভয় নেই, যিনি নির্ভরযোগ্য পদস্পর্শ করিয়ে দেন।

এইভাবে একটির পর একটি দোঁহা লিখে কবীর সর্বসাধারণের মধ্যে তাঁর বাণী প্রচার করতে থাকলেন। প্রথম প্রথম কেউ তাঁর দোঁহা শুনতে আসত না। ধীরে ধীরে অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটল। তখন এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখা গেল। কবীর দোঁহা বলতে বলতে এগিয়ে চলেছেন আর অসংখ্য মানুষ তাঁকে নীরবে নিঃশব্দে অনুসরণ করছেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে কবীরের মধ্যে একটি আলাদা সাধক—সত্তা লুকিয়ে আছে। তিনি তথাকথিত পুরোহিত এবং মৌলবীদের মতো জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন না, স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা করেন না। শহরের বিশিষ্ট মানুষজনও তখন কবীরের সম্পর্কে অন্যরকম ভাবনাচিন্তা করতে শুরু করেছেন। ভবিষ্যতে যিনি একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় মহাসাধক হয়ে উঠবেন, এভাবেই বুঝি শুরু হল তার প্রস্তুতির পালা।

পাঁচ

ইদানীং কবীর আরও বেশি করে শাস্ত্র আলোচনায় মেতে উঠছেন। সমস্ত দিন কেটে যাচ্ছে ধ্যানমগ্ন তন্ময়তার মধ্যে। সাংসারিক জীবনের প্রতি বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই তাঁর। কবীর জেনেছেন যে এই পৃথিবীর সবকিছুই নশ্বর, একমাত্র ঈশ্বরই হলেন এক অবিনশ্বর সত্তা। তাই আমাদের উচিত ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ঈশ্বর—আরাধনায় নিবেদন করা।

সেদিন ধর্ম আলোচনা সেরে বাড়ি ফিরতে তাঁর অনেক রাত হয়ে গেল। কবীর দেখলেন দরজা বন্ধ। বেশ বুঝতে পারলেন তিনি, বাড়ির সকলে এখন নিদ্রামগ্ন। অনেকক্ষণ দরজায় কড়া নাড়লেন কবীর। ভিতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ এল না। কী আর করবেন? ধীরে ধীরে গঙ্গার তীরে চলে গেলেন তিনি। এই জায়গাটি তাঁর খুবই পছন্দের। সামনে দিয়ে বহে চলেছে স্রোতস্বিনী জাহ্নবী। কবীর সেখানে বসে বাকি রাতটুকু কাটিয়ে দিলেন আপনমনে ঈশ্বরচিন্তা করে। তাঁর কেবলই মনে হল, ঈশ্বর বুঝি স্বয়ং তাঁর কাছে এসে দেখা দিয়েছেন। এখন এমনই এক অদ্ভুত অনুভূতি হয় মহাসাধক কবীরের। যখন তখন মনটা হঠাৎ কোথায় যেন হারিয়ে যায়। বেশ কিছুক্ষণ ভাবসমাধিতে নিমগ্ন অবস্থায় থাকেন তিনি। আবার পার্থিব জগতে ফিরে আসেন।

সকাল হল, কবীর বাড়িতে এলেন। স্ত্রী লুই নানা কারণে তাঁর ওপর বেশ রেগে ছিলেন। রাগ করারই কথা! এমন স্বামীকে কোনো স্ত্রী কী পছন্দ করতে পারে যে স্বামী সংসারের কোনো বিষয়েই মাথা ঘামান না? একা হাতে সংসারের সব কাজ করতে হয় বেচারি লুইকে। সহেলিরা তার সঙ্গে নানারকম গল্পগুজব করে। অনেকে বলে তিনি নাকি কবীরকে সংসারে ধরে রাখতে পারছেন না। তার এমন রূপ আর যৌবন আছে, অথচ কবীর সন্ন্যাসী হয়ে ঘুরে বেড়ান কেন?

লুই কবীরকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—কাল সারারাত তুমি কোথায় ছিলে? কেন তুমি ঠিক সময়ে বাড়িতে আসো না? সংসারের কোনো কাজ তুমি করো না কেন? কীভাবে সংসার চলে তা কী একবার ভেবে দেখেছ?

কবীর এসব কথা শুনে বিন্দুমাত্র রাগ করলেন না। কবীর জানেন ধৈর্য্য এবং স্থৈর্য ছাড়া আমরা জীবনের কোনো কাজে সফল হতে পারি না। তিনি বললেন, গতকাল রাতে আমি বাড়ি এসেছিলাম। অনেক ডাকাডাকি করেও কারও সাড়া না পেয়ে চলে গেছি। গঙ্গার ধারে বসে একা মনে পরম করুণাঘন ঈশ্বরের সাধনা করছিলাম। তাঁকে সবসময় ডাকো, তিনিই তোমার সংসার সমুদ্রের হাল ধরবেন।

এই কথা বলে কবীর একটি দোঁহা উচ্চারণ করলেন—

দীন দয়াল ভরোসে তেরে
যত পরবারু চরাইয়া বেড়ে।।

অর্থাৎ, হে দীন দয়াল, তোমার ওপরই ভরসা। আমার সব পরিবারকে তোমার নৌকায় চড়িয়ে দিলাম।

এহেন স্বামীর সঙ্গে কী ঝগড়া করা যায়? হয়তো লুই বুঝতে পেরেছিলেন যে, কবীর হলেন এক অন্য জগতের বাসিন্দা। তাকে আমরা সংসারের রুদ্ধ কারার চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে পারব কী করে?

ইদানীং মাঝেমধ্যে পিতা নীরুও কবীরের কাজে খুবই দুঃখবোধ করেন। তিনি বুঝতে পারেন যে কবীর কোনো সাধারণ মানুষ নন, কিন্তু সংসারের কিছু কিছু কাজ তো করা দরকার। কবীর হাটে যান না, তাঁতে হাত দেন না। সংসারের জন্য কোনো আয় করেন না। এইভাবে কি দিন চলে?

পিতার কাছে বকুনি খেয়ে কবীর হয়তো কোনোসময় আনমনে তাঁতঘরে প্রবেশ করেন। কিন্তু মনটা কোথায় যেন চলে যায়। কিন্তু তিনি কর্মবিমুখ বা অলস প্রকৃতির ছিলেন না। তিনি জানতেন তাঁর ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব ভালোভাবে পালন করতেই হবে। সংসারের সমস্ত কাজকর্ম পালন করার পাশাপাশি আমরা ঈশ্বর আরাধনায় মগ্ন হয়ে থাকতে পারি।

কবীর ধর্মের মধ্যে কোনো সাম্প্রদায়িকতাকে কখনো প্রশ্রয় দিতেন না। ধর্মকে তিনি এক বহতা স্রোতস্বিনীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। সেকালের ধর্মগুরুরা নানাভাবে মানুষকে প্রতারণা করতেন। ধর্ম নিয়ে ছিনিমিনি খেলতেন। কবীর সেখানে গিয়ে রুখে দাঁড়াতেন। ভবিষ্যতে কী হবে তা তিনি ভেবে দেখতেন না। তাই মাঝেমধ্যে তাঁকে নানা তর্কবিতর্কের মধ্যে পড়তে হত। কোথাও কোথাও আটকে পড়তেন তিনি। আবার ফিরে এসে তাঁতঘরে ঢুকে তাঁত বুনতেন। কাপড় নিয়ে হাটে যেতেন। এর পাশাপাশি সদা—সর্বদা ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন থাকত যুবক কবীরের মন।

দেখতে দেখতে বেশ কয়েকটা বছর কেটে গেল। কবীর এবার বুঝতে পারলেন ঈশ্বর সাধনার জন্য একজন সৎগুরুর প্রয়োজন। কিন্তু এমন গুরু তিনি কোথায় পাবেন? কবীর তো পাঠশালায় যাবার সৌভাগ্য অর্জন করেননি। তিনি ছিলেন একেবারে নিরক্ষর। কিন্তু তাঁর মধ্যে এমন একটা জ্ঞানসত্তার জাগরণ ঘটে গিয়েছিল যে, তিনি পৃথিবীর যে—কোনো বিষয় বুঝতে পারতেন। দুরূহ দার্শনিক ব্যাখ্যা তাঁর কাছে সহজ সরল হয়ে যেত। হয়তো জন্ম জন্মান্তরের তপস্যার ফলে এমন প্রাজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন মহাত্মা কবীর। তিনি অনেকদিন ধরে যথেষ্ট পরিশ্রম করে নাথ বিদ্যার গুপ্ত যোগক্রিয়া আত্মস্থ করেছিলেন। তবে কবীর কিন্তু যোগবাদে বিশ্বাস করতেন না। তাঁর কেবলই মনে হত এইসব হঠযোগীরা নানাভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করেন। ধর্মের সঙ্গে তারা এক রহস্যতন্ময়তাকে জুড়ে দেন। নিজেদের ভাবেন ঈশ্বরের সার্থক প্রতিমূর্তি। কবীর ভালোবাসতেন ভক্তিবাদ। তিনি জানতেন আমরা চোখের জলে দেবতার চরণ ধুয়ে দিতে পারি। তবেই দেবতা আমাদের ওপর প্রসন্ন হবেন। কবীর বিশ্বাস করতেন যে, ঈশ্বর আরাধনার জন্য যোগবাদ এবং ভক্তিবাদের সার্থক সমন্বয় প্রয়োজন। একে অন্যের পরিপুরক হয়ে উঠলে তবেই আমরা ঈশ্বরকে লাভ করতে পারব। যোগের দ্বারা দেহ এবং মনকে সংযত করতে না পারলে ভক্তিবাদকে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে না। ভক্তিতে হৃদয়কে বিগলিত করে তুলতে হবে। চিত্তকে করতে হবে আপ্লুত। তবেই তো পরম করুণাঘন ঈশ্বরের সঙ্গে আমরা মেতে উঠব অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায়।

নিজের শক্তিতে অগাধ বিশ্বাস ছিল কবীরের। তা সত্ত্বেও তিনি গুরুর প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করতে পারলেন না। ভারতের অধ্যাত্ম চেতনে গুরুবাদকে আমরা যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান করে থাকি। যুগে—

যুগান্তরে, কালে—কালান্তরে কত সাধক গুরুর সন্ধানে ঘর ছেড়েছেন। অরণ্য অভ্যন্তরে গিয়ে কঠিন কঠোর তপস্যায় রত হয়েছেন। পৌঁছে গেছেন মগ্ন মৈনাকের কাছে। উপযুক্ত গুরু না থাকলে শিষ্যের দেহ ও মনের পূর্ণ পরিস্ফুটন ঘটে না। কিন্তু এখন কোথায় এমন এক গুরু পাওয়া যায়? ঘুরতে ঘুরতে কবীর কখনো চলে যেতেন কোনো এক হিন্দু সন্ন্যাসীর আখড়ায়। কখনো বা মুসলমান ফকিরের আশ্রমে পৌঁছে যেতেন। কোনো সাধু সন্ন্যাসী অথবা ফকিরকে দেখলেই ভাবতেন ইনিই হয়তো আমার পূর্বজন্মের গুরু। কিন্তু কেউই কবীরকে শিষ্য হিসাবে বরণ করতে চাইতেন না। হিন্দু সন্ন্যাসীরা বলতেন, তুই মুসলমান। তুই জোলার ঘরে মানুষ হয়েছিস। তোর মুখে ধর্ম, ঈশ্বরলাভ এসব কথা মানায় না। এসব ভাবনা ছেড়ে দিয়ে তুই তাঁত বুনে সংসার চালা। তুই আবার সাধনার কী বুঝিস?

মুসলমান ফকিররা বলতেন, তুই তো প্রায়ই হিন্দুদের সঙ্গে গিয়ে তাদের ধর্ম নিয়ে আলোচনা করিস। আমাদের চোখে তুই একটা বিধর্মী কাফের ছাড়া আর কেউ নোস। তুই আল্লাকে উপাসনা করার যোগ্য নোস।

এসব কথা শুনে কবীর মনে মনে খুবই কষ্ট পেতেন। ঈশ্বর, আল্লা—এসব তো একই সত্তার বিভিন্ন নাম। তাহলে মানুষে মানুষে এত দ্বন্দ্ব কেন? আহত মনে কবীর এসব কথাই ভাবতেন। এসব অপমানের কোনো প্রতিবাদ তিনি করতেন না। সব অপমান মাথায় পেতে নিয়ে নীরবে চলে আসতেন। তবু কবীরের মন থেকে আশা কখনোই চলে যায়নি। এমনই বিশ্বাস ছিল তাঁর। তিনি জানতেন একদিন এই অন্ধকার পথের শেষে উজ্জ্বল দীপশিখার সন্ধান তিনি পাবেন। কিন্তু সেদিন কবে আসবে? তখন কবীর হয়তো কেমন অসহায় হয়ে উঠেছেন। কেবল—ই ভাবছেন— হে ঈশ্বর, তুমি বলে দাও তোমার চরণে ঠাঁই কবে পাব? দেখতে দেখতে আমার জীবন থেকে একটির পর একটি বসন্ত চলে যাচ্ছে। মানুষ কী চিরকালের জন্য এই পৃথিবীতে আসে?

সেবার কবীর শুনলেন কাশীধামে এক মহাশক্তিমান বৈষ্ণব সাধক এসেছেন। তিনি নাকি ধর্মে ধর্মে, মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ করেন না। তাঁর নাম রামানন্দ, তিনি বৈষ্ণব হলেও রামের পরম উপাসক। রামকে তিনি ব্রহ্মের পূর্ণ অবতার হিসাবে স্বীকার করেন। কবীর এই কথা শুনে মনে মনে ঠিক করে ফেললেন ওই মহাসাধক রামানন্দের কাছে গিয়েই তিনি দীক্ষা নেবেন। কিন্তু ভয় হল, সমস্ত সাধু এবং ফকিররা যেমন তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, রামানন্দও কী সেইভাবেই তাঁকে সরিয়ে দেবেন? নাকি তিনি পরম স্নেহভরে তাঁকে বুকে টেনে নেবেন!

এসব কথা ভাবতে ভাবতে কবীরের রাতে ঘুম হয় না। শেষপর্যন্ত তিনি পৌঁছে গেলেন রামানন্দের আশ্রমে। অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে গুরুর কাছে তাঁর মনের সব কথা নিবেদন করলেন। সাধক রামানন্দ মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ করতেন না। তিনি ছিলেন প্রগতিপন্থী মহাসাধক। কিন্তু তাঁর শিষ্যরা কবীরের পূর্ব পরিচয় জানতেন। তাঁরা সকলে মিলে রামানন্দের সামনে এসে দাঁড়ালেন। আপত্তি তুলে তাঁরা বললেন এক মূর্খ মুসলমানকে যদি বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা দেওয়া হয় তাহলে বৈষ্ণব ধর্মের অকল্যাণ হবে। যে ধর্মের মহান পরম্পরা অনেক সাধকের জীবনব্যাপী সাধনার মাধ্যমে তৈরি হয়েছে, সেই ধর্মকে এইভাবে কলুষিত করা উচিত নয়। শুধু তাই নয়, এছাড়া অনেকে বলেছিলেন যে, কবীর এক মুসলমান জোলা হয়ে যদি হিন্দু সাধকের কাছে দীক্ষা নেন, তাহলে তাঁর ওপর নানা ধরনের অন্যায় অত্যাচার হবে। একজন বৈষ্ণব সাধক হিসাবে রামানন্দ কিন্তু এসব দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে থাকতে চেষ্টা করতেন। তাঁর কাছে পৃথিবীর সবকিছুই ছিল রামের আধারে ভরা। কিন্তু তিনি তাঁর প্রধান শিষ্যদের কথা ভেবে কবীরকে দীক্ষা দিতে রাজী হলেন না। অথচ ধর্মসাধনার প্রতি কবীরের মনের মধ্যে যে গভীর নিষ্ঠা ছিল তা রামানন্দ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাঁর মনে তখন জেগেছে নানা প্রশ্ন। তিনি বারবার ঈশ্বরের শরণাপন্ন হচ্ছেন। এমনভাবে এক অসহায় মানুষকে কি দূরে ঠেলে রাখা উচিত? কবীরকে দীক্ষাদান করা সম্ভব হল না, রামানন্দের এই সিদ্ধান্ত শুনে কবীর খুবই কষ্ট পেয়েছিলেন। মনে মনে তিনি রামানন্দকেই তাঁর গুরু বলে মেনে নিলেন। তখন থেকে চোখ বন্ধ করে তিনি রামানন্দের কথাই চিন্তা করতেন।

বাড়ি ফিরে আসার পর কবীরের মনোবেদনা আরও কয়েকগুণ বেড়ে গেল। তবুও হতাশ হলেন না, তিনি ছিলেন ইতিবাচক মনের মানুষ, তাঁর কেবলই মনে হল একদিন রামানন্দের ওই হৃদয় গলে যাবে। সেদিন তিনি কবীরকে আর প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন না। রামানন্দকে দেখামাত্র কবীরের মনে হয়েছিল, এই মহান ব্যক্তিই হলেন তাঁর জন্ম—জন্মান্তরের সৎগুরু। এর কাছেই সবকিছু নীরবে নিবেদন করতে হবে। রামানন্দের হাত ধরেই পৌঁছোতে হবে সেই ঈপ্সিত তীর্থে যেখানে পরম করুণাঘন ঈশ্বর বা আল্লাহর অবস্থান। রামানন্দের জীবনধারা তিনি লক্ষ করেছেন। তিনি পরম বিস্ময়ভরে তাকিয়ে থেকেছেন ওই মহাত্মা মানুষটির মুখের দিকে। যে মানুষ এমন সদাচারী তিনি একদিন না একদিন আমার ওপর সদয় হবেন। শিষ্যদের কাছে তিনি যেসব উপদেশ দান করেন তাও একমনে শ্রবণ করেছেন মহাত্মা কবীর। প্রতিটি উপদেশের মধ্যে জীবনকে পরিশুদ্ধ করার কথাই বলা হয়ে থাকে। পরিদৃশ্যমান এই পৃথিবীতে তুমি এসেছ কয়েকদিনের জন্য, ঈশ্বর তোমার ওপর এক গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তোমার উচিত একমনে সেই দায়িত্ব পালন করা। এসব কথা শুনতে শুনতে কবীরের সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলী জুড়ে এক আশ্চর্য শিহরনের জন্ম হয়। কবীর চোখ বন্ধ করেন, তাঁর কেবলই মনে হয় তাঁর মন—আকাশে বুঝি হাজার সূর্যের আলো জ্বলে উঠছে।

রামানন্দ সবসময় রামনাম জপ করেন। রামের কীর্তি—কাহিনি সকলের কাছে তুলে ধরেন। রাম—কীর্তনের সময়ে তাঁর চোখ থেকে লবণাক্ত অশ্রুধারা নির্গত হয়। রামানন্দ একদিকে পরম জ্ঞানী, পৃথিবীর সমস্ত শাস্ত্রে তাঁর অধিকার। অন্যদিকে তিনি একনিষ্ঠ ভক্ত। কবীর বুঝতে পেরেছিলেন এমন জ্ঞানী এবং ভক্ত মানুষই তাঁকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারবেন।

রামানন্দ প্রতিদিন ব্রাহ্ম মুহূর্তে স্নান করতে যেতেন। তখন তিনি অবস্থান করছেন কাশীধামে। কবীর একদিন এক ভয়ংকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। স্থির করলেন যে করে হোক রামানন্দের কাছে নিজেকে একেবারে নিবেদন করতে হবে। সমস্ত রাত জেগে কাটিয়ে দিলেন। ভোর হবার আগেই পায়ে পায়ে পৌঁছে গেলেন গঙ্গার ঘাটে। সিঁড়িতে শুয়ে থাকলেন তিনি।

রামানন্দ তখন আপনমনে রামগান করতে করতে এগিয়ে চলেছেন পবিত্র ভাগীরথীর দিকে। তখনও চারদিকে ঘন অন্ধকার। একটু একটু করে পূবের আকাশ ফরসা হতে শুরু করেছে। প্রভাতের প্রথম পাখির গান শোনা যাচ্ছে। নিশান্তিকার আলো বিদায় নিচ্ছে ভালোবাসার পৃথিবী থেকে। সহসা রামানন্দ চমকে উঠলেন, বেশ বুঝতে পারলেন তিনি, কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকা একজন মানুষের গায়ে তাঁর পা লেগে গেছে। তাঁর মুখ দিয়ে ছুটে এল স্বতঃস্ফূর্ত দুটি শব্দ 'রাম রাম'। তারপর 'রাম রাম' জপ করতে করতে গঙ্গার দিকে এগিয়ে গেলেন রামানন্দ।

কবীর বোধহয় এই অলৌকিক মুহূর্তের জন্য অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি ভাবলেন দীক্ষাদানের সময় গুরু যে মন্ত্র দান করতেন, তাঁকে আজ পরোক্ষভাবে স্পর্শ করে সেই মন্ত্র বোধহয় দান করলেন স্বামী রামানন্দ। তখন থেকেই তিনি মনেপ্রাণে রামানন্দের বাহক এবং শিষ্য হয়ে উঠলেন। কবীর স্থির করলেন এখন থেকে জীবনের বাকি দিনগুলি রামনাম করেই অতিবাহিত করবেন। রামের মহিমা এবং রামের কীর্তির কথা সকলের কাছে প্রচার করবেন।

সংসারধর্ম পালনের পাশাপাশি কবীর তখন কপালে তিলক কেটে রামগানে মগ্ন হয়েছেন। হিন্দু এবং মুসলমান সমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ তাঁর এই আচরণ দেখে একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। হিন্দুর কাছে তিনি ছিলেন অস্পৃশ্য জোলা মুসলমান আর মুসলমানের কাছে তিনি ছিলেন কাফের হিন্দু ঘেঁষা এক শত্রু। নীরু এবং নীমা কবীরের এই আচরণ দেখে খুবই বিচলিত হয়ে পড়লেন। তাঁরা সাংসারিক মানুষ। তাঁরা জানেন সংসারের মধ্যেই বসবাস করতে হয়। কবীরের এই আচরণের প্রতিবাদ নানাদিক থেকে আসছে। কথাটা যদি দেশের শাসকের কানে পৌঁছে যায়, তাহলে সর্বনাশ। তাই তাঁরা স্থির করলেন যে করেই হোক কবীরের মন পাল্টাতে হবে। কিন্তু কবীর যেভাবে একমনে রামের সাধনা করে চলেছেন, তিনি কী কারও কথা শুনবেন? তবু চেষ্টা তো করতেই হবে।

সময় এবং সুযোগ পেলে তাঁরা কবীরের সঙ্গে এ বিষয়ে নানা আলোচনা করেন। মা—বাবা কবীরকে বোঝাবার চেষ্টা করেন কিন্তু কবীর তখন একেবারে অন্য জগতের বাসিন্দা হয়ে গেছেন। কবীর কথা বলেন, কিন্তু মা—বাবা বুঝতে পারেন যে সেই কথা বলার সঙ্গে মনের কোনো সংযোগ নেই। রামভাবে আচ্ছন্ন হয়ে আছেন তাঁদের পালিতপুত্র।

হিন্দু সমাজের সকলে একবাক্যে বলতে থাকল সাধক গুরু রামানন্দকেই এই ব্যাপারে দায়বদ্ধ করা উচিত। কারণ রামানন্দ যদি কবীরের প্রতি করুণাবর্ষণ না করতেন, তাহলে কবীর কী রামসাধক হয়ে উঠতে পারতেন? রামানন্দের জীবনধারায় কখনো কোনো কলঙ্ক স্পর্শ করেনি। ভোরের আকাশের মতোই পরিষ্কার তাঁর দেহ মন। তাহলে? জীবনের উপান্তে দাঁড়িয়ে তিনি এমন একটি নিন্দার্হ কাজ করলেন কেন?

এই কথাগুলো শেষপর্যন্ত রামানন্দের কানে পৌঁছে গেল। রামানন্দ অবাক হলেন। জ্ঞানত তিনি কখনো কোনো অন্যায় কাজ করেননি। যদিও মুসলমান জোলার ঘরে পালিত কবীরকে তিনি যথেষ্ট স্নেহ করতেন, কিন্তু প্রধান শিষ্যদের মুখ চেয়ে কবীরকে দীক্ষা দেননি। কবীরকে তিনি ডেকে পাঠালেন। কবীর রামানন্দের আশ্রমে উপস্থিত হলেন। দেখলেন গুরু একটি পর্দাঘেরা জায়গায় বসে পুজোর আয়োজন করছেন। তাঁর কাছে পুজোর বিভিন্ন উপকরণ আছে, তবু কী একটা জিনিসের অভাব তিনি অনুভব করছেন। তাই পূজা অর্চনা শুরু করতে পারছেন না তিনি। অথচ জিনিসটি কী রামানন্দ তা বুঝতে পারছেন না!

পর্দার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা দিব্যজ্ঞানী কবীর বুঝতে পারলেন যে রামানন্দের কোন বস্তুটি দরকার। গুরুকে বলে দিলেন—স্বামীজি, আপনি ইষ্টদেবতাকে তুলসীপত্র নিবেদন করতে ভুলে গেছেন।

কবীরের মুখ থেকে এই কথাগুলি শুনে আশ্চর্য হলেন পরমগুরু রামানন্দ। তিনি বুঝতে পারলেন কবীরকে হয়তো এক মুসলমান জোলার ঘরে লালিত পালিত হতে হয়েছে, কিন্তু কবীর এক দিব্যজ্ঞানী। ভারতের ধর্মজগৎকে নানাভাবে সেবা করার জন্যই বোধহয় কবীরের আগমন! অনেকদিন আগের কথা মনে পড়ে গেল রামানন্দের। তিনিই একদিন ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন কবীরের জন্ম সম্পর্কে। এক ব্রাহ্মণ বিধবার গর্ভে জন্ম হবে ওই দিব্যপুরুষের—একথাও বলেছিলেন। শেষপর্যন্ত কবীর এই ধরাধামে এসেছেন মানবতাবাদের মূর্ত প্রতীক হয়ে। তারপর একে একে রামানন্দ তাঁর দিব্যজ্ঞানে কবীরের বিষয়ে অনেক কথা জানতে পারলেন। জানতে পারলেন যে কবীর কীভাবে মুসলমান জোলা নীরু আর নীমার পরিবারে মানুষ হয়েছেন, এখন হয়েছেন তাঁর একনিষ্ঠ সেবক ও শিষ্য!

এসব কথা সর্বজন সমক্ষে বলতে পারলেন না স্বামী রামানন্দ। পুজো শেষ হল। তিনি দেখলেন তখনও কবীর পর্দার পাশে একমনে রামের ধ্যান করে চলেছেন। রামানন্দকে দেখে কবীরের ধ্যান ভেঙে গেল। রামানন্দ কবীরকে শান্ত কণ্ঠস্বরে বললেন—আচ্ছা কবীর, তুমি আমার কাছে একবার দীক্ষা নিতে এসেছিলে, কিন্তু আমি তো তোমাকে দীক্ষা দিইনি। তাহলে তুমি কেন সবার কাছে বলে বেড়াচ্ছ যে তুমি আমার শিষ্য?

তখন কবীর তাঁকে সব কথা খুলে বললেন। সেকথা শুনে রামানন্দ বলেছিলেন, কিন্তু গুরুর বিনা অনুমতিতে এভাবে কী কোনো গুরু—শিষ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হতে পারে?

কবীর বললেন—কেন পারে না? সেদিন ভোরে আমার দেহটি আপনার পায়ে ঠেকে গিয়েছিল। আপনি 'রাম রাম' শব্দ দু—বার উচ্চারণ করেছিলেন। আমাকে দীক্ষা দিলে আপনি আমার কর্ণকুহরে এই দুটি শব্দই তো উচ্চারণ করতেন। এর থেকে ভালো মন্ত্র আর কী কিছু হতে পারে প্রভু?

কবীরের এহেন ভক্তির আতিশয্য দেখে স্বামী রামানন্দ আরও একবার অবাক হলেন। তিনি মনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূরে ঠেলে সরিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি কবীরকে তাঁর শিষ্য বলে ঘোষণা করলেন।

এতদিন ধরে কবীর কত অনিদ্রিত রাত কাটিয়েছেন। কত আশঙ্কাপূর্ণ প্রহর কেটে গেছে। শেষপর্যন্ত পরম করুণাঘন ঈশ্বর তাঁর মনের বাসনা পূর্ণ করেছেন। কবীরের চোখে এল আনন্দের অশ্রু। ঈশ্বরের করুণা নেমে এসেছে গুরুর মাধ্যমে। মাটিতে লুটিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানালেন গুরুর চরণে। এরপর গুরুদেব বেশ কয়েকটি উপদেশ দিয়েছিলেন কবীরকে। তিনি বলেছিলেন— ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার। তাঁকে যখন যে

যেভাবে ডাকে, তাকে সেইভাবেই তিনি কৃপা করেন। সংস্কার এবং বিধিমতে তাঁর উপাসনা করলেও তিনি সন্তুষ্ট হন। আবার যদি আমরা তাঁর চরণতলে ভক্তির নৈবেদ্য নিবেদন করি, তাহলেও তাঁর সান্নিধ্য লাভ করা যায়। যার যেমনভাবে ভালো লাগে, সে সেইভাবেই ঈশ্বরের সাধনা করতে পারে। এই ব্যাপারে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এটিই হল বৈষ্ণব ধর্মের মূল কথা। আর বৈষ্ণব ধর্মের আর—একটি সার কথা হল ঈশ্বর এক। তিনি এক পুরুষ, ভক্তই হচ্ছে প্রকৃতি। পত্নী যেমন পতিকে ভালোবাসে, সেইভাবে স্ত্রীরূপে ভক্ত প্রকৃতিগতভাবে ঈশ্বরের পূজা করে। ঈশ্বরের সেবার মাধ্যমেই সে তার জীবনের পরম পরিপূর্ণতা খুঁজে পায়। শেষে একদিন ঈশ্বরের মধ্যেই সে লীন হয়ে যায়। পতিপরায়ণা পত্নীর মতো ভক্ত তার সমস্ত মনপ্রাণ, ত্যাগ, তিতিক্ষা, অনুভূতি, ভালোবাসা, প্রেরণা ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করে। সে একেবারে আত্মহারা হয়ে যায়। অপার অনন্ত আনন্দ লাভ করে।

রামানন্দের মুখ—নিঃসৃত এই অমৃতবাণীগুলি শ্রবণ করার সঙ্গে সঙ্গে কবীরের সমস্ত মনপ্রাণ একেবারে শান্ত হয়ে গেল। কবীর ধর্মের গূঢ়তত্ত্বকে অনুভব করতে পারলেন। রামানন্দ আরও বলেছিলেন—কবীর তুমি একমনে রামনাম জপ করে যাও। তুমি সংসারে থেকেই ধর্ম সাধনায় নিজেকে নিয়োগ করবে। কাজকর্মে কখনো ফাঁকি দেবে না। তারই ফাঁকে যে সময় পাবে, ঈশ্বর আরাধনা করবে। এর ফলে ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটবে তোমার। তুমি এমন এক জগতে প্রবেশের ছাড়পত্র পাবে, যে জগতে দেখবে শুধুই আলোর উৎসার। অন্ধকার সেখানে কখনো প্রবেশ করতে পারে না।

এইভাবে রামানন্দ তাঁর প্রিয় শিষ্যকে আরও বেশি জ্ঞানী এবং প্রাজ্ঞ করে তুললেন। এসব কথা শোনার পর কবীরের নিরাসক্ত মন সংসারের প্রতি আরও নির্লিপ্ত হয় পড়ল। তাঁর সমগ্র আত্মার মধ্যে তখন এক আশ্চর্য জাগরণ ঘটে গেছে। তিনি সংসারের খাওয়া—পরার জন্য যেটুকু কাজ করা দরকার, শুধু সেটুকু কাজই করতেন। কোনো বৈষয়িক বিষয়ের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র আকর্ষণ কখনোই ছিল না। এখন তিনি আরও বেশি করে ত্যাগী হয়ে উঠলেন। কখনো জীবনে সামান্য বিনোদন চাইতেন না তিনি। তাঁর মা, বাবা, স্ত্রী কত দুঃখ করতেন, কত কান্নাকাটি করতেন, কিন্তু কবীর ছিলেন এক নির্বিকার মানুষ। কবীর বুঝতে পেরেছিলেন দু—দিনের এই সংসারে ঈশ্বরানুভূতিই হল পরম সত্য। ঈশ্বরের জন্য সব কিছুকে অনায়াসে অস্বীকার করা যায়, কিন্তু অন্য কোনো কিছুর জন্য ঈশ্বরকে অস্বীকার করা যায় না।

কবীর তখন নিরন্তর রামনাম জপ করে চলেছেন। আর এইভাবে তাঁর চেতনার মধ্যে এক দৈবী শক্তির আগমন ঘটে গেল। কবীর অবশেষে সাধনার সেই উচ্চস্তরে পৌঁছোতে পেরেছিলেন, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে রামনামই এক ও অভিন্ন। তাই একজন ভক্ত যে দেবতার নাম স্মরণ করবেন, সেই দেবতার শক্তির কিছুটা পরিমাণ তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হবে। দৈব শক্তি সঞ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আত্মশক্তি বেড়ে গেল মহাত্মা কবীরের। ঈশ্বর বিশ্বাসের সঙ্গে বেড়ে গেল আত্মবিশ্বাস। গুরুর মহিমা উপলব্ধি করার পর কবীর অনুভব করলেন যে, এই বিষয়টি সকলের কাছে ব্যাখ্যা করা দরকার। নিরক্ষর মানুষেরা শাস্ত্রের গভীরে তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি করতে পারবেন না। তাই তাঁদের কাছে এই বিষয়গুলিকে পৌঁছে দেবার জন্য কবীর ছোটো ছোটো দোঁহা রচনা করতে শুরু করলেন। এক একটি দোঁহার মাধ্যমে তিনি আধ্যাত্মিক জগতের এক—একটি বিষয়কে বিশ্লেষণ করেছেন। এই দোঁহাগুলি শুনলে মনে হয়, এদের মধ্যে এক আশ্চর্য রহস্য লুকিয়ে আছে, প্রতিটি শব্দকে কবীর ব্যবহার করেছেন সচেতনভাবে। ধীরে ধীরে এই দোঁহাগুলি মানুষের মধ্যে যথেষ্ট গ্রহণযোগ্যতা লাভ করল।

তখন কবীরের নাম আশেপাশে গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছে। অনেকে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাঁর কাছে শিষ্য হবার মতো আশা প্রকাশ করেছেন। কবীর এবার স্থির করলেন যে ধর্মপ্রচারের জন্য তঁকে এবার এই গ্রাম ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে হবে। কিন্তু সংসারের এই বন্ধন তিনি ছিন্ন করবেন কেমন করে? কবীর বুঝতে পেরেছিলেন যে, সৎগুরুর সাহায্য ছাড়া আমরা ইষ্ট দর্শন করতে পারি না। সৎগুরুর দর্শন ছাড়া জন্ম—

জন্মান্তরের সংস্কার কখনো চিরকালের মতো দূরীভূত হয় না। এই সংস্কার চলে না গেলে ঈশ্বর দর্শন সম্ভব নয়।

তখনও কবীর কিন্তু সংসারধর্ম পালন করা থেকে নিজেকে বিরত করেননি। তাঁকে রোজ জীবিকার জন্য তাঁত বুনতে হত। বোনা কাপড় নিয়ে বাজারে যেতে হত। তাই থেকে যা উপার্জন হত তাতেই কোনোরকমে দিন কেটে যেত। কোনো কোনো সময় তিনি আবার অর্জিত অর্থের কিছুটা এক দরিদ্র ভক্তের হাতে তুলে দিতেন। দীন—দুঃখী মানুষের প্রতি ছিল তাঁর সীমাহীন ভালোবাসা ও করুণা। কোনো প্রার্থীকে তিনি কখনো বিমুখ করতেন না। অনেক সময় নিজে অনাহারে থেকে অতিথির সেবা করে গেছেন। এভাবেই কবীর হয়ে উঠলেন আতিথ্য এবং করুণার জ্বলন্ত প্রতীক।

একদিন কবীর বাজারে বসে কাপড় বিক্রি করছিলেন। এক গরিব ব্রাহ্মণ সেখানে এলেন। তিনি তাঁর লজ্জা নিবারণের জন্য একখানি বস্ত্র ভিক্ষা করলেন। কবীরের কাছে তখন একটি মাত্র কাপড় ছিল। কবীর সেই কাপড়টি অর্ধেক করে ব্রাহ্মণকে দিতে চাইলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ পুরো একখানি থান চাইলেন। কবীর কোনো কথা না বলে পুরো থানটিই ব্রাহ্মণকে দিয়ে দিলেন। তাঁর কাছে এখন আর কোনো কাপড় নেই। তিনি কী বিক্রি করবেন? কীভাবে পয়সা আয় করবেন? কিছু পয়সা বাড়িতে না দিলে রান্না হবে না। শূন্য হাতে কী করে তিনি বাড়ি ফিরবেন? এসব কথা ভাবতে ভাবতে আর বাড়িতে গেলেন না। বাজারের মধ্যে এক কোণে লুকিয়ে বসে থাকলেন। বাড়িতে কোনো খবর দিলেন না। এইভাবে দেখতে দেখতে পরপর তিনদিন কেটে গেল। বাড়ির লোকেরা তখন অনাহারের মধ্যে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন। সকলের মনে জেগেছে নানা উদ্বেগ। কবীর গেলেন কোথায়?

এইসময় এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। কবীরের অনুপস্থিতির তৃতীয় দিনে পরিচিত একটি মানুষ গোরুর গাড়ি বোঝাই করে নানা খাদ্যসামগ্রী নিয়ে কবীরের বাড়িতে এসে হাজির হলেন। এমন ঘটনা দেখে কবীরের মা নীমা একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। তিনি জানেন কবীর কখনো এত খাদ্যসামগ্রী পাঠাতে পারবেন না। তিনি আরও জানেন যে কবীর কখনো কারও কাছ থেকে অহেতুক দান গ্রহণ করেন না। এই ব্যাপারে কবীরের প্রচণ্ড আত্মমর্যাদা আছে! নীমা সেই লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন—এসব জিনিস কে পাঠিয়েছেন?

লোকটি বলল, কোনো এক রাজা বিশ্বনাথ দর্শন করতে এসেছিলেন। তিনি তোমার ছেলে কবীরের কথা শুনেছেন। তাই এইসব খাদ্যসামগ্রী পাঠিয়ে দিয়েছেন। তিনি তোমার ছেলেকে অনেক করে বলার পরে তবে সে রাজি হয়েছে। তোমার ছেলে একটু পরেই এখানে এসে পড়বে।

এই বলে লোকটি চলে গেল। মা নীমা লোকটির কথা বিশ্বাস করলেন। এই খবর পৌঁছে গেল লুকিয়ে থাকা কবীরের কাছে। সব শুনে কবীর আরও একবার অবাক হলেন। কোনো রাজার সঙ্গে তাঁর কখনোই দেখা হয়নি। কেউ তাঁকে এভাবে অনুরোধও করেনি। কবীর বুঝতে পারলেন এ হল পরমেশ্বরের লীলা। তিনি বোধহয় নানাভাবে ভক্তকে পরীক্ষা করেন। যাতে কবীরের পরিবারবর্গ অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত না হন, তাই তিনি নিজেই উদ্যোগী হয়ে খাদ্যসামগ্রী পাঠিয়ে দিয়েছেন। তিনি বুঝতে পারলেন ঈশ্বর সবসময়ে তাঁর ভক্তের পাশেই থাকেন। এই কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর ঈশ্বরভক্তি আরও বেড়ে গেল।

তিনি বাড়ি ফিরে ভক্তদের নিয়ে মহোৎসবের আয়োজন করলেন। সেই মহোৎসবে বহু লোকের হাতে প্রসাদ তুলে দিলেন। এইভাবে সমস্ত খাদ্যসামগ্রী খরচ হয়ে গেল। তাতে কবীর বিন্দুমাত্র দুঃখিত হননি। এতজনকে তিনি ঠিকভাবে খাবার দিতে পেরেছেন, একথা ভাবতেই তাঁর মনে অপার আনন্দ দেখা দিল। তিনি বললেন, ঈশ্বর যে খাদ্যসামগ্রী দয়া করে দিয়েছেন, তাতে শুধু আমার একার অধিকার থাকবে কেন? তাতে সকলের সমান অধিকার আছে। যতক্ষণ থাকবে, যে আসবে, সে—ই খাদ্যের অংশ পাবে।

এই মহোৎসবের কথা কাশীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। যাঁরা এতদিন কবীরকে ঈশ্বরের অবতার বলে স্বীকার করতে রাজি ছিলেন না, তাঁদের মনোভাবে পরিবর্তন ঘটে গেল। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে কবীর হলেন ঈশ্বরের অনুগৃহিত এক মহাসাধক। তাঁর সংস্পর্শে জীবনের সমস্ত অন্ধকার কেটে যায়। কবীরের মধ্যে

যে দানশীলতা আছে তারও প্রশংসা করতে লাগলেন সকলে। কবীরের এই প্রশংসার কথা শুনে কিছু স্বার্থান্বেষী ব্রাহ্মণ সমাজপতি ও সন্ন্যাসী অত্যন্ত রেগে গেলেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন অবিলম্বে কবীরের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতার প্রাচীর তুলতে হবে। না হলে তাঁদের জীবিকা এবং জীবন ধারণ করা অসম্ভব হয়ে উঠবে। তাঁরা জানতেন কবীরের ঘরে আর কোনো খাদ্যসামগ্রী নেই। তাই তাঁরা কবীরকে অপমান করার জন্য দলবদ্ধভাবে তাঁর বাড়ির সামনে পৌঁছে গেলেন। তাঁরা বললেন—আমাদের দাবি যদি না মানো তাহলে ব্রাহ্মণদের আগে শূদ্রদের খাওয়ানোর অপরাধে তোমাকে কাশী থেকে বের করে দেবো।

কবীর ভাবতে পারেননি যে তাঁর আচরণে ব্রাহ্মণরা এইভাবে তাঁকে অপমান করার জন্য ছুটে আসবেন। ব্রাহ্মণরা তখন কবীরের বাড়ি ঘেরাও করেছেন।

কবীর কিন্তু এসব বিক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণদের দেখে এক মুহূর্তের জন্যও বিচলিত হননি। তিনি তাঁদের কাছে গিয়ে পরম শ্রদ্ধাভরে প্রণাম নিবেদন করলেন। তাঁরা কেন এখানে এসেছেন সেই কারণটা জেনে নিলেন।

কিন্তু ঘরে তো চাল, ডাল কিছুই নেই। কী করে এতজন অভুক্ত ব্রাহ্মণের মুখে অন্ন তুলে দেবেন তিনি? এসব কথা ভাবতে ভাবতে কবীর হয়তো একটু চিন্তাচ্ছন্ন হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মুখমণ্ডলে বিরক্তি অথবা দুশ্চিন্তার কোনো চিহ্ন ফুটে ওঠেনি। তিনি শান্তকণ্ঠে বললেন, আপনারা দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখুনি আসছি।

খাদ্য সংগ্রহের নাম করে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেলেন মহাত্মা কবীর। তিনি বেরিয়ে যাবার পর দেখা গেল কেশব বানজারা নামে এক ধনী ব্যবসায়ী মজুরদের মাথায় বস্তা বস্তা আটা, ময়দা, চাল, চিনি চাপিয়ে কবীরের বাড়িতে এসে দিয়ে গেলেন। এইসব খাদ্যসামগ্রী অপেক্ষমান ব্রাহ্মণদের সামনে রাখা হল। কবীরের অনুপস্থিতিতে ব্রাহ্মণরা নিজেরাই ঠিক করে নিলেন যে তাঁরা সিধা হিসাবে আড়াই সের করে চাল, চিনি আর —এক চিড়া করে পান পাবেন।

কবীর এসবের কিছুই জানতেন না। তিনি তখন ব্রাহ্মণদের ভয়ে বাড়ি থেকে দূরে গিয়ে একটি গাছের আড়ালে লুকিয়ে বসেছিলেন। সেখানে কে একজন ব্রাহ্মণের বেশে কবীরের কাছে এসে বললেন—তুমি এখানে লুকিয়ে আছো কেন? তুমি কী জানো না তোমার বাড়িতে ব্রাহ্মণদের ভালো রকমের সিধা দেওয়া হচ্ছে।

কবীর বুঝতে পারলেন যে, পরম করুণাঘন ঈশ্বর তাঁকে আরও একবার অপমানের হাত থেকে বাঁচালেন। ঈশ্বর যে এইভাবে সর্বদা তাঁর পাশে পাশে থাকবেন, সেই উপলব্ধিই হল মহাত্মা কবীরের। তিনি বাড়িতে ফিরে গেলেন। ব্রাহ্মণরা মনোমতো সিধা পেয়ে দু—হাত তুলে কবীরকে আশীর্বাদ করতে করতে চলে গেলেন।

এইসব ঘটনার কথা চারপাশে প্রচারিত হতে লাগল। কবীরের ভক্তসংখ্যা বেড়ে গেল। সকলে বুঝতে পারলেন যে কবীর হলেন ঈশ্বর অনুগৃহীত এক মহাপুরুষ। তখন কবীর তাঁত বোনার কাজ একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর দিন কাটছে শুধুমাত্র রামের নাম জপ করে। এর পাশাপাশি তিনি অসংখ্য ভক্তকে উপদেশ দেওয়া শুরু করলেন। কীভাবে আমরা জীবনের সমুদ্রের ওপারে পৌঁছে যাব সেকথা বলতে লাগলেন। কবীর সহজ সরল উদাহরণের মাধ্যমে ধর্মের গূঢ় তত্ত্বকথা সকলের সামনে শোনাতেন। যখন কবীর ধর্ম আলোচনা করতেন, তখন তাঁর সমস্ত শরীর দিয়ে এক অলৌকিক আভা প্রকাশিত হত।

একবার এক ভক্ত কবীরের কাছে এসে জানতে চেয়েছিলেন, আচ্ছা ঈশ্বর কোথায় অবস্থান করেন?

কবীর বললেন—ঈশ্বর কোনো বস্তু বা স্থানের মধ্যে সংকীর্ণভাবে আবদ্ধ হয়ে নেই। তিনি এই বিশ্বজগতের সর্বত্র বিরাজমান। পৃথিবীর সমস্ত নরনারী তাঁর অপার করুণা লাভ করে থাকেন।

এই কথা বলেই কবীর একটি সুন্দর দোঁহা উচ্চারণ করেছিলেন। এই দোঁহার মাধ্যমে তিনি ঈশ্বরের মহিমার কথা প্রচার করেন।

কবীর বলেছিলেন—

মৈ তে তেরে পাসসেঁ।
নামৈ দেবল, নামৈ মসজিদ,
না কাবে কৈলা সমে।
না তো কৌন ক্রিয়া কর্মমেঁ,
নহী যোগ বৈরাগসে।
খোঁতী হোয় ও তুরতৈ মিলিহৌ,
গল তরঙ্গী অসলমেঁ।
কহৈঁ কবীর, শুনো ভাই সাধো সব স্বাসোরী শ্বাসমে।।

ওরে বান্দা, আমাকে কোথায় খুঁজে বেড়াচ্ছিস? আমি তো সদাসর্বদা তোর পাশে পাশেই আছি। আমি দেউল অথবা মন্দিরে থাকি না, মসজিদ, কাবা কিংবা কৈলাসে আমার অবস্থান নেই। আমি কোনো আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মে বিশ্বাস করি না। যোগ, বৈরাগ্যের প্রতি আমার কোনো আকর্ষণ নেই। যদি তুই সত্যি সত্যি আমার সন্ধান পেতে চাস, তাহলে একপলকের খোঁজাতেই পেয়ে যাবি। কবীর বলেন—ভাই সাধু, তিনি আছেন সব জীবের প্রাণে।

ভারতের সাধক—সাধিকারা যুগে যুগান্তরে, কালে কালান্তরে একথাই বারবার উচ্চারণ করেছেন। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিযোগকেই শ্রেষ্ঠযোগ বলে বর্ণনা করেছেন। অর্জুন একদা শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—যাঁরা কর্মযোগে তৎপর হয়ে ভক্তি সহকারে আপনার উপাসনা করেন, তাঁরাই অধিক যোগী নাকি যাঁরা অক্ষর অব্যক্ত পরমাত্মার উপাসনা করেন তাঁরাই অধিক যোগী?

ভক্তের মুখ থেকে উচ্চারিত এই প্রশ্ন শুনে মৃদু হেসে শ্রীকৃষ্ণ জবাব দিয়েছিলেন—যাঁরা আমাতে মন আবিষ্ট করে আমাতে নিত্য যুক্ত হয়ে এবং আমাতে শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা রেখে উপাসনা করেন, আমার মতে তাঁরাই হলেন শ্রেষ্ঠ যোগী।

কবীর কিন্তু ঠিক এইভাবেই ঈশ্বর আরাধনা করে গেছেন। কবীর জানতেন যোগের সঙ্গে জ্ঞানের প্রয়োজন, আর জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির সংযোগ দরকার। এই ত্রিবিধ সাধনায় সফল হলে আমরা ঈশ্বরের অশেষ অনুগ্রহ লাভ করতে পারব। কবীরের অন্তরে ছিল দিব্যজ্ঞানের প্রজ্জ্বলিত আগুনশিখা, কবীর কিন্তু সেই জ্ঞানের কথা সর্বজনসমক্ষে প্রকাশ করতে চাইতেন না। তিনি সকলের মধ্যে মিলে মিশে ঈশ্বরের আরাধনা করতে চাইতেন। তাঁর মধ্যে ছিল ভক্তির উচ্ছ্বসিত প্রবাহ। সেই ভক্তিরসকে তিনি সকলের মধ্যে সঞ্চারণ করার চেষ্টা করে গেছেন।

কবীর প্রায়শই বলতেন শুধুমাত্র যোগ—সাধনার দ্বারা ঈশ্বরপ্রাপ্তি কখনোই সম্ভব নয়। যোগের সঙ্গে জ্ঞানের সংমিশ্রণ ঘটাতে হবে। শুধু শারীরিক সংযম আর শমদমের দ্বারা আমরা কখনো পরম সত্যকে উপলব্ধি করতে পারব না। যে পরমাত্মা বা পরম ব্রহ্ম এই স্থল—জল—অন্তরীক্ষে বিরাজমান, তাঁকে শুধুমাত্র যোগের দ্বারা অনুভব করা সম্ভব হয় না। যা শুধু আত্মগম্য, তা কখনোই শরীর দ্বারা লভ্য নয়। যথার্থ আত্মজ্ঞান হলে তবেই আমরা ঈশ্বরের অনুভূতি লাভ করতে পারব।

এইজন্য যেসব যোগী গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে উপযুক্ত আত্মজ্ঞান ছাড়া ঈশ্বরকে লাভ করতে চান, কবীর তাঁদের বারবার ধিক্কার দিয়েছেন। কবীরের মতে এইভাবে শরীরকে কষ্ট দিয়ে কখনো ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করা যায় না। তিনি বলেছেন—

মন না রগাঁয়ে রগাঁয়ে যোগী কাপড়া
আসন মারি মন্দিরমে বৈঠে,
ব্রহ্মনাশি পূজন লাগে পথরা।।

অর্থাৎ হে যোগী, তুই মন না রাঙিয়ে কাপড় রাঙালি? মন্দিরে আসন পেতে বসলি? ব্রহ্মাকে ছেড়ে পাথরকে পূজা করতে লাগলি? হিন্দু—মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই ধর্ম সম্পর্কে কোনো জ্ঞান

অর্জন করতে পারে না। তাদের কাছে ধর্ম কতকগুলি অনর্থক অনুষ্ঠানের সমাহার। এইসব মানুষের সমালোচনা করতেন কবীর। এঁরা নানাভাবে ধর্মের বাতাবরণকে কলুষিত করছেন, এমন কথা প্রায়শই ঘোষণা করতেন। ধর্ম সম্পর্কে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ উদার। তিনি জানতেন এক ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের কোনো বিবাদ বা বিতর্ক নেই। কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের পটভূমি তৈরি করেন আর এভাবেই নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে থাকেন।

একটি দোঁহায় মুসলমানদের আজান দেওয়ার ব্যাপারে কবীর মন্তব্য করেছিলেন—

না জানৈ সাহব কৈসা হৈ।
মুল্লা হোকর বাংলা জো দেবৈ
ক্যা তেরা সাহব বহরা হৈ।।
কীড়ীকে পগ নেবর রাজে,
সো কী সাবে শুনতা হৈ।

অর্থাৎ জানি না তোর প্রভু কীরকম। মোল্লা হয়ে যে আজান দিস, তোর প্রভু কী কালা? ক্ষুদ্র কীটের পায়ে নুপূর বাজে তাও তিনি শুনতে পান।

অনেকে নানাভাবে ভক্তিরসে প্রাবল্য দেখিয়ে মানুষকে ভয় দেখান। অনেকে নিজেকে ঈশ্বরের সার্থক প্রতিস্পর্ধী হিসাবে ঘোষণা করেন। অনেকে যোগের মর্মকথা না জেনে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস জীবনের সন্ধানে অরণ্য অভ্যন্তরে চলে যান। এঁদের উদ্দেশ করে কবীর বলেছেন— ওরে যোগী, কান ফুটো করলি, জটা রাখলি আর দাড়ি রেখে হয়ে গেলি ছাগল। জঙ্গলে গিয়ে ধুনি জ্বাললি। কামকে দমন করে ছ্যাচড়া হলি, গীতা পড়ে পড়ে হলি মিথ্যাবাদী। কবীর বলছে, শোনরে সাধুভাই, তোকে ধরে নিয়ে গিয়ে যমরাজ দরজায় রাখবে।

প্রকৃত জ্ঞানের অভাব যাদের মধ্যে আছে, তারা এইসব বাহ্যিক আচরণ করে নিজেকে সকলের কাছে মহান করে দেখাতে চায়। ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাস থাকলে তবেই আমরা এইসব সংস্কারের প্রতি আকর্ষণ বোধ করি। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে, পৃথিবীর সর্বত্র ঈশ্বরের অধিষ্ঠান আছে এমন কথা মনে প্রাণে মনে করতে হবে।

হিন্দু—মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মৌলবাদী কিছু মানুষ কবীরের এই সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণীকে মন থেকে মানতে পারলেন না। তাঁদের কাছে কবীর তখন এক জীবন্ত বিপদস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাই তাঁরা সেকালের পাঠান বাদশাকে সবকিছু জানালেন। এই বাদশা তখন দিল্লি থেকে কাশীতে এসেছিলেন। তিনি মন দিয়ে সব অভিযোগ শুনলেন।

অবশ্য এই বাদশা ছিলেন মহাত্মা কবীরের পরম ভক্ত। তিনি হলেন সিকন্দর লোদি। কবীরের অলৌকিক অভিযাত্রার কথা তাঁর কানে পৌঁছে গেছে। বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি এক ভয়ংকর অসুখে ভুগছিলেন। সারা গায়ে তাঁরা চাকা চাকা ফোস্কা হয়ে গেছে। সবসময় গভীর জ্বালা অনুভব করেন তিনি। শাসনকাজে আর মন দিতে পারেন না। অনেক মুসলমান হেকিম এবং হিন্দুদের বৈদ্যদের ডাকিয়ে এনেছেন। কেউ তাঁর এই শারীরিক যন্ত্রণার উপশম ঘটাতে পারেননি। শেষপর্যন্ত কাশীতে এসে কবীরের দৈবশক্তির ওপর নির্ভর করলেন ওই বাদশা।

কবীর অনায়াসেই সারিয়ে দিলেন বাদশার এই দূরারোগ্য ব্যাধি। তাই কবীরের কাছে বাদশা হলেন ঋণী। তবে সমস্ত দেশের অধিপতি হিসাবে তাঁকে প্রজাদের ওইসব অভিযোগের কথা শুনতে হবে বৈকি। তার ওপর তাঁর পীর শেখ তকি কবীরের ওপর ঈর্ষান্বিত হয়েছেন। তিনিও বিচারের জন্য চাপ দিচ্ছেন। কাশীর একদল ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় বারবার এই দাবি তুলছেন। মোল্লারাও যোগ দিয়েছেন তাঁদের সঙ্গে। সব মিলিয়ে পরিবেশ ও পরিস্থিতি তখন জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে।

কবীরকে সর্বজনসমক্ষে ডেকে পাঠানো হল। কবীর গিয়ে দেখলেন শহরের অনেক লোভী পুরোহিত আর মোল্লারা সেখানে পৌঁছে গেছেন। বেশ কিছু মানুষ উৎসুক চিত্তে বসে আছেন। তাঁদের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন যাঁরা কবীরকে এক চলিষ্ণু ভগবান বলে মনে করতেন। কবীর এসে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস আর ঈশ্বর বিশ্বাসের সঙ্গে সকলের সব অভিযোগ অস্বীকার করলেন। বাদশা চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে কবীরকে মৃত্যুদণ্ড দান করেছিলেন। বাদশা জানতেন কবীর অলৌকিক শক্তির অধিকারী। পৃথিবীর কোনো শত্রু তাঁকে হত্যা করতে পারবে না।

আর ঠিক এমন ঘটনাই ঘটে গেল। পরপর তিনবার তিনভাবে কবীরের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার চেষ্টা করা হল। কিন্তু তিনবারই সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেল। একবার কবীরকে হাত—পা বেঁধে একটি ঘরে পুরে দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হল। দাউ—দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন শিখা। ঘরের সব কিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেল, কিন্তু মহাত্মা কবীর পদ্মাসনে বসে থাকলেন অক্ষত দেহে।

এরপর হাত—পা বেঁধে কবীরকে গঙ্গার জলে ফেলে দেওয়া হয়। জলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কবীরের হাত—পায়ের বাঁধন খুলে যায়। অলৌকিক শক্তিবলে তিনি জলের উপর ভাসতে থাকেন।

বাদশাহ তখন রন্ডিজ নামে এক পাগলা হাতিকে কবীরের সামনে ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেই ভয়ংকর পাগলা হাতি কবীরকে পদদলিত করতে পারল না। কবীরকে দেখে সেই হাতি ভয়ে উল্টো দিকে ছুটতে থাকে।

পরপর তিনবার এই অলৌকিক ঘটনা দেখে মোল্লা এবং পুরোহিতরা একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। বাদশাহ বুঝতে পারলেন যে কবীর হলেন এক অনন্ত শক্তির অধিকারী। কবীর এক সিদ্ধপুরুষ। বাদশাহ দিল্লি যাবার সময় কবীরকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কবীর এই প্রস্তাবে রাজি হলেন। বাদশাহ তাঁর সব থেকে সুন্দর হাতিটি কবীরের বাহন হিসাবে নির্দিষ্ট করেন। কবীর সমেত সৈন্যসামন্ত, আমীর, ওমরাহদের নিয়ে বাদশা চলেছেন দিল্লি অভিমুখে।

যাবার পথে প্রয়াগে ত্রিবেণীর তীরে শিবির স্থাপন করা হল। সেদিন দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর কবীর সকলের সামনে দাঁড়িয়ে ধর্মোপদেশ দান করছিলেন। স্বয়ং সুলতান সেখানে এসে পৌঁছোলেন। শিবির স্থাপিত হয়েছিল গঙ্গার ঠিক ধারেই। বাদশা অবাক হয়ে কবীরের মুখ নিঃসৃত অমৃতবাণী শ্রবণ করছিলেন।

এইসময় দেখা গেল গঙ্গার জলে একটি শিশুর মৃতদেহ পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে ভেসে আসছে। সুলতানের পীর শেখ তকি এর আগে মহাযোগী কবীরের আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় পেয়েছেন। তিনি কবীরকে এক মহান সাধকের স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু তখনও শেখ তকির মনে কিছু দ্বিধা—দ্বন্দ্ব এবং সংশয় ছিল। আর ছিল কবীরের প্রতি এক গোপন ঈর্ষা। এতদিন পর্যন্ত তিনিই ছিলেন মুসলিম অধ্যাত্ম—জগতের এক নক্ষত্র, এখন কবীর এসে তাঁকে সেই জনপ্রিয়তা থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। এই বিষয়টি শেখ তকি ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। তিনি ভাবলেন, এই সুযোগে সর্বজনসমক্ষে কবীরকে অপমান করতে হবে। তকি সুলতানকে বললেন—জাঁহাপনা, কবীর সাহেব যদি গঙ্গায় ভেসে আসা এই মৃত শিশুটির দেহে প্রাণের সঞ্চারণ করতে পারেন, তাহলে আমি নির্দ্বিধায় তাঁকে মহাযোগী হিসাবে মেনে নেব।

এই কথা শুনে কবীর মৃদু হাসলেন। তিনি হাত তুলে গঙ্গার দিকে তাকালেন। ভেসে আসা শিশুটিকে নিজের দিকে আকর্ষণ করলেন। কী আশ্চর্য, মৃত শিশু তাঁর ঈশারার অর্থ বুঝতে পেরে গতি পরিবর্তন করে কবীরের দিকে আসতে থাকল। গঙ্গার তীরে কবীর যেখানে বসেছিলেন তার ঠিক নীচে এসে থেমে গেল। স্থির হয়ে জলের ওপর ভেসে থাকল সে।

কবীর তখন গঙ্গার তীরের ওপর পদ্মাসনে বসে ধ্যানমগ্ন হলেন। পরম করুণাঘন ঈশ্বর বা আল্লাহর কাছে নিজের সর্বস্ব নিবেদন করলেন। কিছুক্ষণ বাদে ধ্যান ভেঙে গেল। তিনি শিশুটির দিকে তাকিয়ে বললেন—এই মৃতদেহে আবার আত্মার অধিষ্ঠান হোক।

কবীর এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল। কবীরের ডান হাতের তালু থেকে একটি তীব্র জ্যোতি ঠিকরে বেরিয়ে এল। সেই জ্যোতি শিশুটির মৃতদেহে প্রবেশ করল। সঙ্গে সঙ্গে মৃত শিশুটি চোখ মেলে তাকাল। গঙ্গার জল থেকে উঠে এসে কবীরের পায়ে নিজেকে নিবেদন করল।

চোখের সামনে এমন এক অভাবিত ঘটনা দেখে উপস্থিত সকলে একেবারে হতবাক হয়ে গেলেন। সুলতান এবং শেখ তকিও কম অবাক হলেন না। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে কবীরের মধ্যে অলৌকিক শক্তি এবং ক্ষমতা আছে। সুলতান বললেন—সাবাস কবীর সাহেব, আপনি তো কামাল করে দিলেন।

একথা শুনে কবীর সাহেব শান্তভাবে উচ্চারণ করলেন—সুলতান, আপনি যখন কামাল শব্দটি উচ্চারণ করেছেন, তখন এই শিশুর নাম হোক কামাল।

কামাল শব্দটির অর্থ হল অসাধ্য সাধন। এবার সুলতান সিকন্দর শাহ শিশু কামালের পূর্বজন্মের কথা জানতে আগ্রহী হয়ে উঠলেন। কবীর তখন শিশুটিকে ঈশারায় তা বলতে বললেন। শিশু নিজেই তার পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত বিবৃত করতে লাগল। কবীর জানতেন এই শিশুটি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন।

শিশু কামাল বলতে লাগল—কয়েক বছর আগে উত্তরাখণ্ডে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে আমার জন্ম হয়। আমার একটি বোনও ছিল। পূর্বজন্মের সংস্কারবশে আমরা একটু বড়ো হয়ে হিমালয়ে তপস্যা করতে গিয়েছিলাম। আমাদের জপে তুষ্ট হয়ে মহাত্মা কবীর আমাদের দর্শন দিয়েছিলেন। আমরা তখন তাঁর কাছে আত্মজ্ঞান লাভ করার প্রার্থনা করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন একদিন আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ হবে। তার অল্পদিন পরেই আমাদের মৃত্যু হয়। আমাদের মৃতদেহ গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমার বোনের মৃতদেহ কোথায় গেছে তা আমি জানি না। আর আমার ভাগ্যে যে ঘটনা ঘটল তা তো আপনারা নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন। কামাল সকলকে বুঝিয়ে দিল একমাত্র মহাত্মা কবীরের আশীর্বাদের ফলেই পূর্বজন্মের সব ঘটনা তাঁর মনে এসেছে। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে আরও একবার লজ্জিত হলেন শেখ তকি। তিনি যে এখনও কবীরের প্রতি সন্দেহ এবং বিদ্বেষ পোষণ করছেন, একথা ভেবে তাঁর সমস্ত মনে জাগল নিদারুণ ঘৃণা। নিজেকে ধিক্কার দিতে চাইলেন তিনি। কবীরের মতো এক মহাত্মা পুরুষের সংস্পর্শে আসার ফলে তাঁর জীবনের সমস্ত অন্ধকার দূরীভূত হয়েছে, একথা মনে হল তখন শেখ তকির। তিনি বুঝতে পারলেন যে, কবীর একজন সাধারণ সাধু নন। যোগসাধনার দ্বারা কবীর এমন এক আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করেছেন যার দ্বারা যে—কোনো অলৌকিক কাজ চোখের নিমেষে সমাধা করতে পারেন। পরবর্তীকালে কামাল কবীরের এক বিখ্যাত শিষ্য হয়ে ওঠে। অনেকে আবার এই কামালকে কবীরের ঔরসজাত পুত্র বলে মনে করেন। তবে সাধু সমাজে গুরুকে আধ্যাত্মিক পিতা হিসাবে স্বীকার করা হয়, সেই হিসাবে আমরা কামালকে কবীরের পুত্র বলতে পারি।

কবীর সম্পর্কে আর—একটি গল্প প্রচলিত আছে। রাজধানী দিল্লির দরবারে সিকন্দর লোদি বসে আছেন। শেখ তকি বিষণ্ণ মনে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। কিছুদিন আগে তাঁর সাত—আট বছরের এক শিশুকন্যার মৃত্যু হয়েছে। তাকে কবরও দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনার কথা মনে হলে শেখ তকির মন শোকাচ্ছন্ন হয়ে যায়। একথা ভেবে তকির চোখে জল আসে।

দরবারে ঢুকে তিনি কবীরের উদ্দেশে, সুলতানের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন— কয়েকদিন আগে আমাদের দিল্লি আসার সময় কবীর সাহেব গঙ্গায় ভেসে আসা এক মৃত শিশুর শরীরে প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন। কিন্তু তাতে তাঁর খুব একটা কৃতিত্ব আছে বলে আমার মনে হয় না। কারণ অনেকক্ষেত্রে মানুষকে মৃত বলে ঘোষণা করার পরেও তার প্রাণ মাথার খুলির মধ্যে এক জায়গায় ঢুকে থাকে। পরে সেই মৃতদেহে পচন শুরু হবার আগে যে—কোনো সময় সেই প্রাণ আপনা থেকে বেরিয়ে এসে শরীরের সর্বত্র সঞ্চারিত হয়। তাই হয়তো জলে ভেসে আসা মৃতদেহটিকে জাগিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল। মৃতদেহটিকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়নি। সেটি কবর দেওয়া হয়নি। জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল মাত্র। তাই জলে থাকায় মাথার খুলি থেকে প্রাণ বেরিয়ে আসার সুযোগ পেয়েছিল।

কিন্তু আমার মেয়েটিকে যদি কবীর সাহেব বাঁচিয়ে তুলতে পারেন, তাহলে আমি তাঁর অলৌকিক শক্তিকে অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করব। এমনকি আমি সানন্দে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করব। শুধু তাই নয়, সারাজীবন ধরে তাঁর মহিমা প্রচার করব।

শেখ তকির কথা বলা শেষ হয়ে গেল। সভা—ঘরে হাজির সকলে তখন উন্মুখ হয়ে কবীরের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁদের মনে জেগেছে নানা প্রশ্ন। সত্যিই কী কবীর এক সিদ্ধপুরুষ? তিনি কী শেখ তকির অনুরোধ রক্ষা করতে পারবেন?

শেখ তকির কথা শুনে কবীর সাহেব কেমন যেন হয়ে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে তিনি কী সব ভাবতে লাগলেন। তারপর চোখ খুললেন। শেখ তকিকে তাঁর কন্যার কবরের কাছে নিয়ে যেতে বললেন। শেখ তকি খুব খাতিরযত্ন করে কবীরকে সেই কবরখানায় নিয়ে গেলেন। কবীর সাহেব সেখানে গিয়ে কবরের মুখ খুলে দিতে বললেন। এই বিষয়টি দ্রুত চারিদিকে প্রচারিত হয়ে গেছে। দলে দলে উৎসুক জনতা এসে হাজির হয়েছেন সেখানে। তাঁরা নিজের চোখে কবীরের অলৌকিক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করতে চান।

কবরের মুখ খোলা হল। কবীর শবটির দিকে তাকিয়ে জোর গলায় বললেন, ওগো শেখ তকির কন্যা, উঠে এসো তো মা।

এইভাবে পরপর তিন বার নাম ধরে ডাকলেন তিনি। কিন্তু কোথাও কিছু হল না। শবের মধ্যে প্রাণের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। কবীরের অলৌকিক শক্তির জন্য যেসব জনতা এসে ভিড় করেছিল, তাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল অসন্তোষ, শেখ তকি হতাশ হলেন। সুলতান ভাবলেন শেখ তকি ঠিক কথাই বলেছেন। গঙ্গার জলের ধাক্কায় মৃত শিশুটির দেহে প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। এতে কবীরের কোনো হাতযশ নেই। কবীর মিথ্যাই নিজেকে চলমান অবতার বলে ঘোষণা করে থাকেন।

এমন সময় কবীর শেষবারের মতো বলে উঠলেন, উঠে বোসো তো মা কবীরের কন্যা।

এই কটি কথা কবীরের মুখ থেকে নির্গত হবার সঙ্গে সঙ্গে কবরের মধ্যে সহজ মানুষের মতোই উঠে বসলো সে। সেই শিশুকন্যা কবর থেকে বেরিয়ে এসে কবীরের পায়ে লুটিয়ে পড়ল। সে বলল—কবীরই তার বাবা, সারাজীবন ধরে কবীরকেই সে তার পিতা বলে ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছে।

চোখের সামনে এমন এক অভাবিত ঘটনা দেখে শেখ তকি একেবারে আত্মহারা হয়ে গেলেন। তিনি যে মনে মনে কবীরকে ঈর্ষা করেন, সে কথা ভেবেই অনুশোচনা হল তাঁর। তিনি তাঁর অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন। এইভাবে কামাল এবং কামালি দুজনেই কবীরের পুত্র—কন্যা হিসাবে প্রচারিত হয়েছেন। আমরা জানি না এর মধ্যে কোন গল্পটি আসল এবং কোন গল্পটি কল্পনার জারক রসে সঞ্জীবিত হয়েছে।

অনেকে বলে থাকেন তাঁরা হলেন কবীরের পরম প্রিয় শিষ্য এবং শিষ্যা। তবে অলৌকিকভাবে এদের দেহে প্রাণ সঞ্চারের ঘটনার কথা কবীরপন্থী জীবনীকাররা সকলেই স্বীকার করেছেন। কবীরের অলৌকিক জীবন সম্পর্কে যেসব গ্রন্থ লেখা হয়েছে সেখানে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে এই দুটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য সাধুরাও কামাল—কামালির এই আশ্চর্য জীবন ফিরে পাওয়ার কাহিনি নানাভাবে বর্ণনা করেছেন। এই বিশ্লেষণগুলি পড়লে মনে হয় কবীর হয়তো এমন এক মহাশক্তির অধিকারী ছিলেন যার দ্বারা তিনি মৃত্যুকে পর্যন্ত অতিক্রম করতে পেরেছিলেন।

৭

মহাত্মা কবীরের জীবনে এমন অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেছে। তার মধ্যে দুটি ঘটনার কথা আমরা উল্লেখ করব। আমরা জানি কবীর লুই নামে এক মুসলমান কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। এই লুই—এর জীবনকথাও বড়ো চিত্তাকর্ষক। তিনিও ছিলেন এক পরম সাধিকা। তাঁর প্রাকজীবনের ইতিহাস কৌতূহলে ভরা।

সে—সময়ে গঙ্গার ধারে নির্জন বনে এক ধার্মিক মহাপুরুষ বসবাস করতেন। একদিন সকালে তিনি আশ্রম থেকে বেরিয়ে গঙ্গায় স্নান করতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ দেখতে পেলেন কম্বলে জড়ানো কী একটা বস্তু গঙ্গার স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। তিনি বুঝতে পারলেন যে, এই বস্তুটি মৃত নয়, এর মধ্যে প্রাণস্পন্দন আছে। অসহায় এই জীবটির প্রতি দয়া জাগল ওই সাধকের মনে। তিনি কম্বল জড়ানো জীবটিকে জল থেকে তীরে এনে তুললেন। দেখলেন একটি শিশুকন্যা। স্নান সেরে তিনি শিশুকন্যাটিকে আশ্রমে নিয়ে গেলেন। ওই মহাত্মা পুরুষের যত্ন ও সেবায় মেয়েটি ধীরে ধীরে বড়ো হয়ে উঠল। মহাপুরুষ তাঁর পালিতা কন্যা হিসাবে মেয়েটির পরিচয় দিতেন। যেহেতু তিনি তাকে কম্বলে জড়ানো অবস্থায় পেয়েছিলেন, তাই তার নামকরণ করা হল লুই।

ধীরে ধীরে সেই মহাত্মা পুরুষ বৃদ্ধ হলেন। তাঁর অন্তিমকাল উপস্থিত হল। লুই তাঁকে দেখে আর্তনাদ করে কাঁদতে থাকলেন। এই নির্জন বনে তিনি কী করে একা থাকবেন? এই আশঙ্কা জাগল তরুণী লুই—এর মনের মধ্যে।

তখন মহাপুরুষ বললেন—মা, আমার মৃত্যুর পর তোমাকে আর বেশিদিন একা থাকতে হবে না। তাছাড়া তোমার কোনো বিপদ হবে না। তোমার চারপাশে গণ্ডী কাটা আছে। কিছুদিনের মধ্যে এক মহাত্মা পুরুষ এখানে আসবেন। তিনি হবেন মহাসাধক। তাঁর কাছে তুমি আশ্রয় পাবে। তবে একটি কথা, সেই মহাত্মা পুরুষের আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত তুমি এ স্থান ছেড়ে অন্য কোথাও যাবে না।

অবশেষে সেই সাধকের মৃত্যু হল। লুই চোখের জলে ভেসে গেলেন। দিন গোনা শুরু হল তাঁর। যখন কোনো ব্যক্তি সেখানে আসত, লুই উৎসুক হয়ে তাঁর নাম—ঠিকানা জানতে চাইতেন। কিন্তু সেই মহাত্মা কবে আসবেন? ধীরে ধীরে লুই হতাশ ও নিরাশ হলেন।

একদিন দুজন সাধক ঘুরতে ঘুরতে সেই আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। লুই তাঁদের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করলেন। দু—পেয়ালা গরম দুধ এনে দুজনের সামনে রাখলেন। তাঁদের মধ্যে একজন পরম তৃপ্তিভরে সেই দুধ পান করলেন। অন্যজন কিন্তু দুধের পাত্র ছুঁয়েও দেখলেন না। লুই এই আশ্চর্য আচরণের কারণ জানতে চাইলেন। সাধু বললেন—আমি শব্দাহারী, আমি শুনতে পাচ্ছি আর—একজন সাধু এখানে আসছেন।

এই কথা শুনে লুই জিজ্ঞাসু চোখে চারিদিকে তাকালেন। কিন্তু কোনো মানুষকে দেখতে পেলেন না। কিছুক্ষণ পর লুই দেখলেন যে সত্যিই এক সাধু কোথা থেকে এখানে এসে হাজির হয়েছেন। লুই তখন ওই সাধুর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর পরিচয় জানতে চাইলেন। সাধু উত্তরে শুধু একটিই শব্দ বললেন—কবীর।

লুই তাঁর জাত গোত্রের কথা জানতে চাইলে সাধু মৃদু হেসে আবারও কবীর শব্দটিই উচ্চারণ করেছিলেন।

লুই তাঁর ধর্মের কথা জানতে চাইলেও তিনি উত্তরে বললেন—আমি কবীর।

এবার লুই তাঁর লোকান্তরিত পালক পিতাকে স্মরণ করলেন। লুই বুঝতে পারলেন এই কবীরই হলেন তাঁর জীবনের পথপ্রদর্শক। লুই কবীরকে বললেন—মহারাজ, আমাকে দয়া করে আপনার আশ্রমে নিয়ে চলুন।

কবীর বললেন—তুমি যাবে আমার আশ্রমে? চলো, সেখানে গেলে তোমাকে কোনো পার্থিব দুঃখ—কষ্টের সামনে দাঁড়াতে হবে না। আমরা সদাসর্বদা পরমপুরুষ ঈশ্বরের নাম ভজনা করি।

কিছু কিছু কবীরপন্থী তাই বলে থাকেন যে লুই ছিলেন কবীরের শিষ্যা। কবীর নাকি বিয়েই করেননি। কবীরের একটি দোঁহাতে লুই—এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে এইভাবে—

কহত কবীর শুনছ রে লোঈ।
নহম কিসীকে, ন হমরা কোঈ।।

অর্থাৎ এই পৃথিবীতে কেউ কারও আপন নয়।

আর—একটি দোঁহাতে কবীর ধনিয়া নামের এক নারীর উল্লেখ করেছেন। কবীরের কোনো কোনো জীবনীকার ধনিয়াকে তাঁর স্ত্রী বলে তুলে ধরেছেন। এই ধনিয়ার আর—এক নাম ছিল রামজনিয়া।

আর—একটি গল্পের কথাও আমরা এখানে বলব। এই গল্পটি বিশ্লেষণ করলে আমরা বুঝতে পারব যে, কবীরকে কতভাবে ঈশ্বরের সামনে পরীক্ষা দিতে হয়েছে। প্রতিটি পরীক্ষাতেই কবীর জয়যুক্ত হয়েছেন।

একবার ভগবান তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য স্বর্গের সুন্দরী অপ্সরাকে ডেকে পাঠালেন। ভগবান বললেন—বারাণসীতে কবীরদাস নামে এক ভক্ত আছে। তুমি আজই তার কাছে চলে যাও। তোমার মোহিনী মায়া এবং রূপ—যৌবনের ডালি দিয়ে তাঁকে বশ করতে হবে।

স্বয়ং ভগবানের আদেশ পেয়ে ওই অপ্সরা নিজেকে সুন্দর সাজে সজ্জিত করে মায়াবিনী রূপ ধারণ করল। তাকে দেখে মনে হল স্বয়ং রম্ভা বুঝি শুকদেবকে সম্মোহিত করার জন্য এগিয়ে চলেছে। তার দৃষ্টি যারই ওপর পড়ে সে—ই কামবাণে বিদ্ধ হয়। কত মুনিঋষির মন টলে যায়। অপ্সরা অবশেষে পৌঁছে গেল কাশীধামে। সে তপস্যারত কবীরের কাছে গিয়ে বলল—শোনো, আমার এই নয়ন ভোলানো রূপের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকো, চোখ নামিয়ে নিও না। কত যোগী আমাকে পাবার জন্য জন্ম—জন্মান্তর ধরে তপস্যা করেছে। কাশীধামে কত পুণ্যবান আমাকে আলিঙ্গন করার জন্য চেষ্টা করেছে। তবু তারা কেউ আমাকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারেনি। তুমি আমাকে উপভোগ করো, তা নাহলে তোমাকে আমি এমন অভিশাপ দেব যে তোমার সমস্ত জপতপ একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে।

অপ্সরার সেই অনিন্দসুন্দর মায়াবিনী রূপ দেখে অথবা তার মুখ নিঃসৃত এমন বিনোদিনী বাক্য শুনে কবীরের মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না। কবীর শান্ত এবং সংযতভাবে বললেন—বলো মা, স্বর্গলোক কী অরণ্য হয়ে গেছে? স্বর্গলোকে থাকতে তোমার কী এমন অসুবিধা হচ্ছে যে তুমি মর্ত্যলোকে নেমে এসেছ? মর্ত্যেই যদি আসো তাহলে রাজপ্রাসাদে যাচ্ছ না কেন? রাজা তোমাকে যথেষ্ট সমাদর করে বরণ করে নেবেন। আমি দীন দরিদ্র দুঃখী সন্ন্যাসী। তোমাকে দেবার মতো তো আমার কিছুই নেই। অতি তুচ্ছ আমার পেশা। জপতপ, সাধন ভজন সেভাবে করতে পারি না। শুধুমাত্র ভক্তি দিয়ে যতটুকু পারি ঈশ্বরের আরাধনা করি। সবকিছুর দিক থেকে আমি তুচ্ছ। আমি জড় প্রস্তরের মতো, সুখ কী তা আমি জানি না। আমোদ প্রমোদের কোনো অনুভূতি আমাকে কখনো আকর্ষণ করে না। আমি ইন্দ্রিয়ের দাসত্ববৃত্তি করি না। আমার হৃদয়ে হরি অবস্থান করছেন, সেখানে তোমার ঠাঁই হবে না। তোমার রূপ আর তোমার চোখের দৃষ্টি বিষের মতোই পরিত্যজ্য বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে।

অপ্সরা ভাবতেই পারেনি যে তার এই ছলনা ব্যর্থ হবে। এর আগে সে কতবার ভগবানের আদেশে বিভিন্ন মুনিঋষির জপতপ ভঙ্গ করেছে। কিন্তু কবীরের কাছে তাকে পরাস্ত হতে হল। এবার স্বয়ং ভগবানের কাছে ফিরে গেল সে। সব কথা বর্ণনা করল। ভগবান বুঝতে পারলেন এভাবে কবীরকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করা উচিত হয়নি। ভগবান কবীরের সামনে এসে দেখা দিলেন। তাঁকে বর দিতে চাইলেন। ভগবান প্রশ্ন করলেন—কবীর তুমি কী চাও? অষ্টসিদ্ধি? নবরত্ন? নাকি সসাগরা পৃথিবীর ওপর আধিপত্য?

এইসব প্রশ্ন শুনে কবীরের মনের মধ্যে কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। চোখের সামনে পরম কাঙ্ক্ষিত ঈশ্বরকে দেখে তিনি খুবই আনন্দিত হলেন। তারপর শান্ত হয়ে বললেন—হে ত্রিভুবনেশ্বর, আপনার কৃপাদৃষ্টি ছাড়া এসব কিছুই আমি চাই না। আমি এখন এক ভাববিহ্বল অবস্থায় আছি। আপনি কী বলছেন তা আমি বুঝতে পারছি না। ভালোমন্দ, ন্যায়অন্যায় সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই আমার। আমার সব কিছুই তো আমি আপনার হাতে ছেড়ে দিয়েছি। এত বড়ো দান আমি গ্রহণ করব কেমন করে? ছোটো একটি পিঁপড়ে কী পাহাড়কে তুলতে পারে? তারকা কী চন্দ্রকে আবৃত করতে পারে? অন্তর্জলি দ্বারা কী সাগর সিঞ্চন সম্ভব? আমি আপনার এক দীন দরিদ্র শিষ্য, আমি বিষ আর মধুর তারতম্য বুঝতে পারি না।

কবীরের এই কথা শুনে ভগবান সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন।

কবীরের উদারপন্থী ধর্মমত তখন ক্রমশ আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ধীরে ধীরে বাড়ছে তাঁর ভক্ত এবং অনুগতের সংখ্যা। কিছু কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ তখন কবীরকে সহ্য করতে পারছেন না। তাঁরা চেষ্টা করছেন কী করে জনসমক্ষে কবীরকে হেয় করা যায়।

গোরখ গোষ্ঠীতে লিখিত একটি কাহিনিতে লেখা আছে যে, একবার বৌদ্ধ নাথ সম্প্রদায়ের যোগী গোরখবাবা শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করার জন্য কবীরের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি এসেই কবীরের শক্তি পরীক্ষা করার জন্য মাটিতে একটি ত্রিশূল পুঁতে দিলেন। তারপর ত্রিশূলের একটি ফলার ওপর নিজে বসলেন। অন্য একটি ফলাতে বসার জন্য কবীরকে আহ্বান করলেন। তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল কবীর এই আহ্বান কখনোই রক্ষা করতে পারবেন না।

কবীর গোরখবাবার কুমতলব বুঝতে পারলেন। তিনি তাঁতের মাকু থেকে কিছুটা সুতো বের করে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। মনে হল সুতোটার যেন কোনো শেষ নেই। সুতোটা চোখের নিমেষে দূর আকাশে উঠে গেল। কবীর সেই সুতো ধরে অনেক উঁচুতে পৌঁছে গেলেন। তারপর সেই সুতোর একপ্রান্তের ওপর বসলেন। গোরখবাবাকে বলতে লাগলেন—নাথজি, আপনার ত্রিশূল তো মাটিতে পোঁতা। ওখানে বসা মানায় না আপনার। ওখান থেকে উঠে এসে সুতোর ওপর বসুন। এই সুতো নিরালম্ব হয়ে অনন্ত আকাশে পৌঁছে গেছে। এর থেকে ভালো জায়গা পৃথিবীতে আর কোথাও নেই!

এই কথা শুনে গোরখনাথ পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। তিনি মাথা নত করে কবীরকে প্রণাম করে অবিলম্বে ওই স্থান ত্যাগ করলেন।

একবার গোরখনাথ কবীরকে প্রশ্ন করেছিলেন—কে তোমাকে সিদ্ধি দিল? কে তোমার হাতে দণ্ড কমণ্ডুল দান করল? কে তোমাকে হরিনাম শোনাল? কে দিল জপমালা?

এতগুলি প্রশ্ন শুনে কবীর মোটেই রেগে গেলেন না। তিনি একে একে শান্ত সহজভাবে সবকটি প্রশ্নের জবাব দিলেন। কবীর বললেন—স্বয়ং ব্রহ্মা আমাকে দণ্ড আর কমণ্ডলু দান করেছেন। আমায় মৃগছাল দিয়েছেন স্বয়ং শিব। গুরু আমাকে হরিনাম শুনিয়েছেন। আর বিষ্ণু দিয়েছেন জপমালা।

এই উত্তর শুনে গোরখনাথ অবাক হয়ে গেলেন! তিনি বুঝতে পারলেন যে কবীরের মধ্যে এক ভাবসত্তার উদয় হয়েছে। তবু কবীরকে আরও পরীক্ষা করা দরকার। তিনি বললেন—অণ্ডাল, মণ্ডাল আর চারি খুলি এসবের মানে জানো কী? না জানো তো ঝোলা আনো। অর্থাৎ আমাদের দলে এসে যোগ দাও।

কবীর এই কথা শুনে একটু হেসে বললেন—অণ্ডাল মানে পৃথিবী, মণ্ডাল মানে আকাশ, চারি খুলি মানে চন্দ্র, সূর্য আর দু—কান। ঝোলা আর মালার কোনো দরকার নেই আমার। আমার গুরু রামানন্দ, তাঁর মতো মহাত্মা পুরুষ পৃথিবীতে আর কেউ নেই। ফের যদি আপনি এসব কথা বলেন, তাহলে বাধ্য হয়ে আমি আপনার কান মলে দেব।

গোরখনাথ বুঝতে পারলেন এখানে থাকা আর উচিত নয়। কবীরের পাণ্ডিত্য এবং ব্যক্তিত্বের কাছে সম্পূর্ণ পরাভূত হয়েছেন তিনি। তিনি অবিলম্বে সেই স্থান ত্যাগ করলেন।

কবীরের উদ্দেশ্য ছিল সহজ সরল ভাষায় ধর্মের বিষয়গুলিকে নিরক্ষর দরিদ্র মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। কবীরের মধ্যে ছিল এক আশ্চর্য সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব। যে মানুষ একবার তাঁর সংস্পর্শে আসতেন, তিনি বারবার তাঁর কাছে আসার চেষ্টা করতেন। তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণ করলে মনে হত আমি বুঝি অমৃতবাণী শুনছি। তাই অনেকেই স্ব—ইচ্ছায় কবীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। কবীর কথায় কথায় সুন্দর সুন্দর দোঁহা বা কবিতা লিখে সাধারণের সামনে বলেছেন। এইভাবে তাঁর ভক্তসংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল।

একদিন বাড়িতে কুয়ো থেকে জল তুলছিল কবীরের মেয়ে কামালী। পিপাসার্ত এক ব্রাহ্মণ যুবক এসে তার কাছে জল চাইল। কবীর তখন বাড়ির মধ্যে বসে কয়েকজনকে ধর্ম উপদেশ দান করছিলেন। কামালী কুয়ো থেকে জল তুলে যুবকটির হাতে ঢেলে দিল। যুবকটি শীতল জল পান করে তৃষ্ণা মেটালো। তারপর

অবাক চোখে কামালীর যৌবন সমৃদ্ধ তনুবাহারের দিকে তাকিয়ে থাকল। কামালীর পরিচয় জানতে চাইল ওই আগন্তুক যুবক। কামালী বুঝতে পারল সে গোঁড়া ব্রাহ্মণ সন্তান, কার হাতে জল পান করেছে তা জানতে হবে বইকি।

যুবক কামালীকে জিজ্ঞাসা করল—তোমার নাম কী? কামালী তার নাম বলতেই যুবক জানতে চাইল—তোমার বাবার নাম কী? কামালী বলল—আমার বাবার নাম কবীর। যুবক বলল তিনি কী করেন? কামালী বলল—তিনি তাঁত বোনেন। আমরা মুসলমান জোলা।

এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে যুবক খুব রেগে গেল। সে বলল—আগে কেন তুই তোর পরিচয় বলিসনি। তোর হাতে জল খেয়ে আমি জাত নষ্ট করলাম।

এই কথা বলে ওই যুবক গলায় আঙুল ঢুকিয়ে বমি করার চেষ্টা করল। সে এত রেগে গিয়েছিল যে, কবীরের সঙ্গে কথা বলতে পারল না। কবীর শান্তভাবে প্রশ্ন করলেন—আপনার এত রাগের কারণ কী?

এবার যুবক বলল—তোমার মেয়ে আমার জাত মেরে দিয়েছে। আগে জানলে তার হাতে আমি জল খেতাম না। আমি এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ সন্তান। আর তোমরা মুসলমান জোলা। একে ছোটো জাত, তার ওপর বিধর্মী।

এই কয়টি কথা বলে যুবক রাগী চোখে কবীরের দিকে তাকাল। এত অপমানজনক কথা শোনার পরেও কবীর কিন্তু একটুও রাগ করলেন না। কবীর যুবকটির মুখের ভাব দেখে একটুখানি শুধু হাসলেন। তারপর তাকে শিক্ষা দেবার জন্য একটি দোঁহা বললেন—

পাঁড়ে, বুঝি পিয় হু তুম পানী।
জিহি মিটিয়াকে ঘরমহঁ বৈঠে,
তামঁহ সিষ্টি সমানী।।
ছপন কোটি যাদব জহঁ ভিজে,
মুনিজন সহস অঠাসী।
পৈগ পৈগ পয়গম্বর গাড়ে,
যো সব সবি ভৌ মাটি।।
তেহি মিটিয়াকে ভাঁড়ে পাঁড়ে,
বুঝি পিয়হু তুম পানী।।
সচ্ছ কচ্ছ ঘরিয়ার বিয়ান্তে
রুধির-নীর ডাল ভরিয়া।
নদীয়া নীচ নরক বহি আবৈ,
অহু মানুষ সব মরিয়া।।
হাত ঝুরী ঝরি গূদ গরী গরি,
দুধ কহাঁতে আয়া।
সো লৈ পাঁড়ে জেবন বৈঠে,
মটিয় হি ছুতি লপায়া।।
বেদ—কিতেব ছাঁড়ি দেউ পাঁড়ে,
ঈ সব মনকে ভরসা।
কহহিঁ কবীর শুনহু পাঁড়ে,
ঈ তু স্থরে হৈ করমা।।

ওহে পাঁড়ে, বুঝেসুঝে জল খাও। তুমি যে মাটির ঘরে বসে আছ, তুমি কী জানো সেই মাটির দ্বারাই সবকিছু তৈরি হয়েছে। ছাপান্ন কোটি যাদব গলে মিশে গেছে এই মাটিতে। এই মাটিতে মিশে গেছে অষ্টাশি

হাজার মুনি। এর প্রতি পদে পদে কত পয়গম্বরকে কবর দেওয়া হয়েছে। সেসব পচে মাটি হয়ে গেছে। ওহে পাঁড়ে, সেই যে মাটি, সেই মাটির ভাঁড়ে বুঝেসুঝে জল খাও। জলে কত মাছ, কচ্ছপ, ঘড়িয়াল বাচ্চা প্রসব করে। জলেতে মিশে যাচ্ছে তাদের রক্ত। নদীর জল তো নরকের নানা আবর্জনা বহে আনছে। তার মধ্যে কত মরা মানুষ পচছে হাড় থেকে ঝরে ঝরে আর মাংস থেকে চুঁয়ে চুঁয়ে যে দুধ হচ্ছে, তা কোথা থেকে আসে তুমি তা জানো কী? ওহে পাঁড়ে, তুমি সেই দুধ নিয়ে খেতে বসেছ আর মাটি নিয়ে ছোঁয়াছুঁয়ি বিচার করছ? ওহে পাঁড়ে, বেদ, কিতাব সব ছেড়ে দাও। এসবই হল তোমার কাজ।

কবীরের মুখ থেকে এই বাক্যগুলি বের হবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ সন্তান যুবকের মনে পরিবর্তন দেখা গেল। মুগ্ধ বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল যুবকটি। এতক্ষণ পর্যন্ত সে ভেবেছিল কবীর এক গোঁড়া, মূর্খ, নীচ মুসলমান। এখন সে আর কোনো কথা বলতে পারল না।

কবীর আবার বলতে লাগলেন—আমি মূর্খ, আমি কোনোদিন কোনো প্রতিষ্ঠানে গিয়ে শিক্ষালাভ করিনি। গুরু আমাকে আদেশ দিয়েছেন তাই আমি গুরুর কথা সকলের সামনে বলছি। ওহে যুবক, আপনি তো জানেন, জাত বিচার মানুষেরই সৃষ্টি। মানুষ নিজের স্বার্থে এই সংকীর্ণ জাল তৈরি করেছে। আবার নিজে এই জালে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে সেখান থেকে বাইরে বের হবার পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

ঈশ্বর বা আল্লাহ হলেন পরম প্রেমময়। তিনি পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে এবং পৃথিবীর সকল সৃষ্টিকে একইরকমভাবে আশীর্বাদ করেন। ঈশ্বর দর্শন হলে বা মনের ভেতর ভক্তিভাবনার জন্ম হলে আমরা সত্যিকারের আনন্দ লাভ করতে পারি, তখন মনের সব সংকীর্ণতা হারিয়ে যায়। দূর হয়ে যায় ভেদজ্ঞান। সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে প্রকৃত আলোকশিখার উদয় হয়। সেই আলোকেই সব অন্ধকার দূরীভূত হয়। তখন বিশ্বের সমস্ত মানুষকে মনে হয় আত্মার আত্মীয়। শুধু মানুষ নয়, মনুষ্যেতর প্রাণীদেরও নিজের বলে কাছে টানতে ইচ্ছে করে। মানুষ সদাসর্বদা অজ্ঞতার জগতে পতিত। সেই বিবর থেকে আমাদের মুক্তি নিতেই হবে। কুসংস্কারের জঞ্জাল দূর করতে না পারলে আমরা পবিত্র সূর্যালোক দেখব কেমন করে? ওহে ভাই, সকলকে ভালোবাসুন, জাতধর্মের কোনো বিচার করবেন না।

কবীরের এসব কথা শুনতে শুনতে যুবকটির মনে আরও পরিবর্তন দেখা দিল। তার কেবলই মনে হল যে তার এই পঁচিশ বছরের জীবনে সে আগে কখনো এমন অমৃতকথা শোনেনি। যুবকটি বুঝতে পারল এই মুসলমান জোলার মধ্যে এক অনন্ত শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ বসে আছেন। না হলে তিনি এত সহজভাবে এসব তত্ত্বকথা বলছেন কী করে? প্রতিটি কথার মধ্যে যে সত্য আছে তা একেবারে অন্তরকে বিদ্ধ করছে।

কবীর আবার বললেন—আপনার দোষ নেই। আপনি পূর্বজন্মের এবং এ জন্মের সংস্কারের বশেই এসব কথা বলছেন। আপনি এক সদগুরুর স্মরণ নিন, আপনার মনের এই ভাব বা সংস্কার সব তিনি দূর করবেন। তখন আপনি এক নতুন পথের সন্ধান পাবেন।

যুবকটি সহসা অনুভব করল কবীরের দুটি চোখের মধ্যে থেকে এক দৈবশক্তি এসে তার হৃদয়ে প্রবেশ করেছে। তার শরীর জুড়ে দেখা দিল এক তীব্র আলোড়ন। সে ছটফট করতে লাগল। কবীরের পায়ে লুটিয়ে পড়ে প্রার্থনা করতে লাগল আর বলতে লাগল—আপনি আমাকে ক্ষমা করুন প্রভু, আমি না জেনে আপনাকে অপমান করেছি। বলুন এর জন্য আমাকে কী শাস্তি ভোগ করতে হবে?

কবীর এবার সস্নেহে যুবকটিকে তুলে ধরলেন। তারপর বললেন—অত দুর্বল হলে চলবে কেমন করে? তুমি না ব্রাহ্মণ সন্তান! মনকে শক্ত করো। সৎগুরুর আশ্রয় নাও। তাহলে নিশ্চয়ই শান্তি পাবে।

যুবক এবার উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করল—এমন গুরু কোথায় আছেন? কবীর বললেন—সন্ধান করলে নিশ্চয়ই পাবে। যুবক বলল, অনেক সন্ধান করেছি, দেখতে দেখতে জীবনের পঁচিশটি বসন্ত কেটে গেছে। কিন্তু তেমন কোনো গুরুর সন্ধান তো আমি পাইনি। আপনি কী তাঁর সন্ধান দিতে পারেন?

কবীর হেসে বললেন—পারব। কিন্তু আমার ওপর তোমাকে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হবে। তুমি তা করতে পারবে তো?

কবীরের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে যুবক অত্যন্ত খুশি হয়ে বলল—হ্যাঁ, পারব।

এতক্ষণে যুবকের মন শান্ত হল। সে কবীরের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করল। তারপর বলল—আমি বুঝতে পারছি যে আপনি আমার গুরু, আপনিই আমাকে দীক্ষা দিন।

কবীর বললেন—তোমাকে আমি দীক্ষা দিতে পারি একটি শর্তে, তা হল, তুমি আগে মনকে প্রস্তুত কর। এখনও তোমার মনে কামনা—বাসনা থেকে গেছে। জাগতিক বিষয়ের প্রতি আছে অদম্য আকর্ষণ। এমন মন নিয়ে তো দীক্ষা নিতে পারবে না। তুমি বাড়িতে যাও, নিজেকে প্রশ্ন করো। তারপর সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে আমার কাছে এসো। আমি কথা দিচ্ছি তোমাকে নিরাশ করব না।

এই কথা শুনে যুবকটি বাড়ি চলে গেল। সে রাতে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল। এর আগে সে নানা বিষয় নিয়ে চিন্তা করছিল। রক্ষণশীল পরিবারের সন্তান। ব্রাহ্মণ বংশে তার জন্ম। এক সামান্য মুসলমান জোলার কাছে দীক্ষা নিলে সকলে কী বলবে? এসব কথা ভাবতে ভাবতে ঘুম আসেনি তার চোখের তারায়। শেষ রাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়ল বেচারি যুবক। ভোরের দিকে স্বপ্ন দেখল যে কবীর তাকে নামমাত্র দীক্ষা দিচ্ছেন। পরে কবীরের মেয়েটির সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে তার।

সকালবেলা ঘুম ভাঙার পর যুবক ভাবল সে কবীরের কাছে যাবে। কিন্তু সত্যি সত্যি সে কী প্রস্তুত? হঠাৎ কবীরের লোক এসে তাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গেল। কবীর বললেন, কাল রাতে তুমি যে স্বপ্ন দেখেছ তা একেবারে সত্যি। তারপর ওই যুবকের দীক্ষা এবং বিয়ের দিন স্থির করলেন। বললেন—আগামী ওইদিন আমি তোমাকে দীক্ষা দেব। আর ওইদিন ওই ক্ষণেই আমার কন্যা কামালীর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে।

মনের দুটি বাসনা একসঙ্গে পূর্ণ হতে চলেছে, যুবক আনন্দে কথা বলতে পারল না। কবীর একটু হেসে বললেন—মনে রেখো এসবই হচ্ছে আল্লাহর দয়াতে। তাই কখনো এমন কাজ করবে না যাতে আল্লাহ বা ভগবান কষ্ট পান। যুবকটি পরবর্তীকালে কবীরের কাছে দীক্ষা নিয়ে তাঁর গৃহশিষ্যে পরিণত হয়। কামালীকে বিয়ে করে সে সুখে—শান্তিতে ঘর—সংসার করতে থাকে।

তখন কবীরের মনে জেগেছে এক অন্য ভাবনা। এতদিন তিনি ঈশ্বর আরাধনায় মগ্ন থাকতেন। সকলের কাছে ভগবানের কথা প্রচার করতেন। এখন তাঁর মনে হচ্ছে যে তাঁর কাজ বোধহয় শেষ হয়ে এসেছে। ঈশ্বর বোধহয় তাঁকে আর বেশিদিন এই ধরাভূমিতে রাখবেন না। অন্য কোথাও অন্য কোনোখানে যেতে হবে কবীরকে।

তাই আজকাল ভক্তদের সঙ্গে কথা বলার সময় কবীর মাঝেমধ্যেই বলেন—

'জো পহিরা সো ফাটি সি কম
ধরালো জাই।'

অর্থাৎ যে কাপড় নিত্য পরা হয় তা তো একদিন ছিঁড়বেই।

এই ক—টি সাধারণ শব্দের মধ্যে অধ্যাত্ম তত্ত্বের একটি গূঢ় বিষয় লুকিয়ে আছে। আমাদের আত্মা দেহরূপ যে বস্ত্র পরিধান করে, সেই দেহ একদিন পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যাবে।

কবীর এবার বুঝতে পারলেন যে তাঁর শেষ সময় উপস্থিত হয়েছে। তিনি কাশীধাম ত্যাগ করে মগহর নামে পাশের গ্রামে চলে গেলেন। কবীর ছিলেন এক দূরদর্শী মহাপুরুষ। তিনি আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, ওই গ্রামেই তাঁর মৃত্যু হবে। তিনি শিষ্যদেরও সেই কথা বললেন। আসলে মগহরে মৃত্যু হলে মানুষ নরকে যায়, এমনই একটা কুসংস্কার ছিল হিন্দুদের মধ্যে। কবীর সেই সংস্কারের মূলে আঘাত করতে চেয়েছিলেন। সব ধর্মের মূল সত্য বিষয়টিকে কবীর পরম শ্রদ্ধাভক্তির সঙ্গে মেনে চলতেন। আবার কোনো ধর্মের কুসংস্কারকে তিনি একেবারেই মানতেন না। মুক্তকণ্ঠে নির্ভীকভাবে সেই কুসংস্কারের অসারতা সকলের কাছে তুলে ধরতেন।

সেকালে হিন্দুরা ভাবতেন কাশীতে মৃত্যু হলে স্বর্গ লাভ হবে আর মগহরে মৃত্যু হলে গাধা হয়ে জন্মাতে হবে। মগহর হল পৌরাণিক যুগের এক বিখ্যাত স্থান। দক্ষরাজা এখানে মহাযজ্ঞ করেছিলেন। সেই যজ্ঞে তিনি শিবকে আমন্ত্রণ জানাননি। কারণ শিব সেই অর্থে উঁচুস্তরের দেবতা নন। শিবের পত্নী সতী অপমান বোধে এবং পিতার প্রতি অভিমানে দেহত্যাগ করেন। শিব তখন পত্নীশোকে বেদনাহত হয়ে যজ্ঞ পণ্ড করে দেন। শিবের অনুচররা দক্ষের মাথা কেটে ফেলে। তখন ব্রহ্মার আদেশে সেখানে একটি ছাগমুণ্ড যোগ করা হয়েছিল। শিব সেই যজ্ঞস্থলে দাঁড়িয়ে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে, শিবের প্রতি ভক্তি না নিয়ে কেউ এখানে দেহত্যাগ করলে সে সদগতি পাবে না। সে বিষ্ণুলোকে যেতে পারবে না। পরজন্মে সে হবে এক অবিশ্বাসী গাধা। এই জাতীয় কুসংস্কারে বিশ্বাস করেন না কবীর। এই পৃথিবীর সমস্ত স্থানই পরম ঈশ্বরের আশীর্বাদপূর্ণ। এখানে কোনো একটি স্থান সম্পর্কে এমন অন্ধবিশ্বাস থাকবে কেন? মগহরের এই অপবাদ দূর করার জন্যই কবীর কাশীধাম ত্যাগ করে ওই অভিশপ্ত মগহরে চলে এলেন।

কবীরের মগহর যাত্রার কথা শুনে অনেকেই তাঁকে অনুসরণ করলেন। এমনকি অনেক রাজ্যের রাজা এবং জমিদাররা পর্যন্ত মগহরে এসে উপস্থিত হলেন। কবীরের সঙ্গে ছিলেন অগণিত কবীর—ভক্ত। তাঁরাও তাঁর সঙ্গে মগহরে যেতে চাইলেন। সেকালের কাশীর রাজা বীরসিংহ দেব, রেওয়ার রাজা বাম সিংহ এবং অযোধ্যার নবাব মহমুদ্দৌলা কবীরের কাছে প্রার্থনা জানালেন যে, তাঁদেরও যেন সঙ্গে নেওয়া হয়। কবীর তাঁদের সেই প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিলেন।

এরপরে দেখা গেল যে জনহীন মগহর এক জনাকীর্ণ নগরে পরিণত হয়েছে। প্রকাণ্ড মেলা শুরু হয়ে গেল সেখানে। কাশীধামে কবীর না থাকায় এবং কবীরের অসংখ্য ভক্ত কাশীধাম ছেড়ে চলে যাওয়ায় এই বিখ্যাত শহরটি হয়ে পড়ল শ্রীহীন।

মনে হল কাশীর সমস্ত আলোই বুঝি নিভে গেছে। চারপাশে নেমে এসেছে ঘন অন্ধকার। মগহরের নবাব বিজলী খাঁ এই বিরাট জন—সমাবেশ দেখে খুবই খুশি হলেন। তিনি সকলেরই আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলেন। কবীর এবং তাঁর অনুগামীদের যেন কোনো অসুবিধা না হয় সেদিকে নজর রাখতে লাগলেন। তবে কাছাকাছি কোনো নদী বা জলাশয় না থাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিল। এত মানুষের পানীয় জল কীভাবে জোগাড় করা হবে! মগহরের নবাব এ বিষয়ে ভেবেচিন্তে কোনো কুলকিনারা করতে পারলেন না।

মগহরের মাঝখান দিয়ে একটি নদী বয়ে গেছে। কিন্তু সেই নদীতে এক ফোঁটা জল নেই। গোটা নদীটা শুকিয়ে একেবারে খটখটে হয়ে গেছে। শোনা যায় এই নদীতে বর্ষাকালেও এক ফোঁটা জল জমে না। এটি হল পৌরাণিক যুগের এক নদী। আগে এই নদী জলে পূর্ণ ছিল। কিন্তু দক্ষযজ্ঞের সময় শিবের অভিশাপে এই নদীর সব জল শুকিয়ে যায়।

ভক্তরা কথাটা কবীরের কানে তুলে দিলেন। কবীর সঙ্গে সঙ্গে নদীর কাছে পৌঁছে গিয়ে একমনে ধ্যান করতে লাগলেন। এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেল। শুকনো নদীখাতে দেখা দিল জলের ধারা। বিশাল জনতা কবীরের নামে জয়ধ্বনি করতে থাকলেন। নদীর নাম রাখা হল অমী। অমীর জল ছিল শীতল আর অমৃতের মতো মধুর। এই নদীর জল পান করে সকলে তৃষ্ণা মেটালেন।

এবার ভক্ত শিষ্যদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন কবীর। কথায় কথায় তাদের কাছে আরও কিছু তত্ত্বকথা শোনালেন। এক—একটি দোঁহার মাধ্যমে মানুষের জীবনকে সৎ শোভন, সুন্দর করার অঙ্গীকার করলেন। তাদের কাছে শেষ উপদেশ দান করা হল। কবীর একটি কুটিরের ভেতর ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। বাইরে সুবিশাল জনতা তখন দাঁড়িয়ে আছে। অনেকের চোখে লবণাক্ত অশ্রুধারা। তাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে মহাত্মা কবীর আর বেশিদিন এই ধরাধামে থাকবেন না।

কবীর একটি দোঁহার মাধ্যমে তাঁর অন্তিম বাসনার কথা সকলের কাছে বলে গেছেন। তিনি চেয়েছিলেন কাশী এবং মগহর সম্পর্কে যেসব কুসংস্কার প্রচলিত আছে সেগুলিকে একেবারে উৎপাটিত করতে। শুধু

তাই নয়, ঈশ্বরের প্রতি তাঁর বিশ্বাস যে কতখানি অটল ছিল তাও দেখাতে চেয়েছিলেন কবীর। তিনি একটি দোঁহার একেবারে শেষে বলেছেন—

কহৈ কবীর সুনহ রে
লোঈ মরতি ন ভুলই কোঈ।
ক্যা কাসী ক্যা মগহর,
উখর রাম জৌ হোঈ।।

কবীরের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, মগহরে মৃত্যু হলেও তাঁর আত্মা রামের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে। তিনি বলেছেন, জল যেমন জলের কাছে যায় এবং জলের সঙ্গে মিশে যায়, তেমনি যার হৃদয়ে রাম ছাড়া অন্য কারও অবস্থান নেই, সে কাশীতে মরলেও রামকে পাবে আর মগহরে তাঁর মৃত্যু হলেও সে রামের চরণ স্পর্শ করতে পারবে। কাশীতে মরলে যার মুক্তি ঘটে, তার কাছে রামের মাহাত্ম্য আর থাকে কোথায়? তাই কবীর মগহরের মতো একটি স্থানকে তাঁর মৃত্যুভূমি বলেই নির্বাচন করলেন। কবীর প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে অধ্যাত্ম—সাধনার ক্ষেত্রে স্থান—মাহাত্ম্য কিছুই নয়। সবথেকে বড়ো হল সাধকের ভক্তিনিষ্ঠা আর সকলের প্রতি অপরিমেয় ভালোবাসা।

কবীর কুটিরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে একটি শব্দ হল। সকলে সবিস্ময়ে দেখল যে একটি জ্যোতি কুটির থেকে বেরিয়ে আকাশের দিকে চলে গেল। বহুদিন আগে আকাশ থেকে একটি জ্যোতি এসে কবীরের গর্ভধারিণী মায়ের গর্ভে প্রবেশ করেছিল। এখন সকলে বুঝতে পারলেন যে কবীরের মহাপ্রয়াণ হয়েছে। তাঁরা সকলে একবাক্যে কবীরের নামে জয়ধ্বনি করতে থাকলেন। প্রথমে কবীরের সঙ্গে দশহাজার ভক্ত এসেছিলেন। হিন্দু—মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অসংখ্য মানুষের সমাবেশ ঘটেছিল সেখানে। হিন্দুদের নেতা হিসাবে সসৈন্যে ছিলেন কাশীর রাজা বীর সিংহ আর মুসলমানদের নেতা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নবাব বিজলী খাঁ।

অমী নদীর তীরে নগরের বিশাল প্রান্তরে ছিল এক সাধুর কুঁড়ে ঘর। সেই ঘর তখন খালি পড়ে থাকায় ভক্তরা সেখানেই কবীরকে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। কবীর সেখানে প্রবেশ করার আগেই ভক্তদের বলেছিলেন কিছু সাদা পদ্মফুল আর দু—খানি সাদা চাদর নিয়ে আসতে।

শিষ্যরা তা নিয়ে এসেছিলেন। কাশীর রাজা বীর সিংহ এসে কবীরের সামনে গিয়ে প্রণাম জানিয়ে বললেন—গুরুজী, কৃপা করে অনুমতি দিন, আপনি মহাপ্রয়াত হলে আপনার পবিত্র দেহ কাশীতে নিয়ে যাব। হিন্দুপ্রথা অনুসারে গঙ্গার তীরে আপনার দেহকে সৎকার করব।

এই কথা শুনে নবাব বিজলী খাঁ বললেন—এ কখনো হতে পারে না। আমি এই পবিত্র দেহ মুসলমান প্রথা অনুসারে কবর দেব।

কবীর বুঝতে পারলেন যে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যদের মধ্যে এক অনভিপ্রেত সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ দেখা দেবে। তাই তিনি তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশে বললেন—আমার আদেশ আমার নশ্বর দেহ নিয়ে তোমরা কেউ কখনো তর্ক—বিতর্ক করবে না। আমি বলছি তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। তোমাদের উভয় পক্ষেরই আশা পূর্ণ হবে। এখন দরজা বন্ধ করে তোমরা চলে যাও।

কবীরের এই কথা শোনার পর সকলে বাইরে চলে গেলেন।

গুরুর মৃত্যুর কথা শুনে সকলে অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগলেন। সব ভেদাভেদ বুঝি দূরীভূত হয়ে গেল।

এবার কুটিরের দরজা খোলা হল। সত্যি দেখা গেল কোনো পক্ষকেই নিরাশ হতে হয়নি। সাদা ধবধবে দুটি চাদর ঘরের মধ্যে পাতা আছে পাশাপাশি। দুটি চাদরে আছে কিছু সাদা পদ্মফুল, শান্তি এবং সখ্যের প্রতীক চিহ্ন হিসাবে। কিন্তু আসল মৃতদেহ কোথায়? সকলে বুঝতে পারলেন যে দিব্যশক্তির অধিকারী মহাত্মা কবীর সশরীরে স্বর্গলোকে চলে গেছেন। আর এই সঙ্গে তিনি সকলকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে, ধর্মের নামে হানাহানি করতে নেই। আমরা দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সংঘর্ষ বাধিয়ে ফেলি, তা করা কখনোই উচিত নয়।

তখন সকলে বিবাদের কথা ভুলে গেলেন। রাজা বীরসিংহ এবং নবাব বিজলী খাঁ প্রয়াত গুরুর নির্দেশ বুঝতে পারলেন। বুঝতে পারলেন যে এইজন্যই গুরুজি বলে গিয়েছিলেন যে তিনি কোনো পক্ষকেই নিরাশ করবেন না।

রাজা বীরসিংহ একটি চাদর এবং তার ওপরের পদ্মফুল নিয়ে কাশীধামে পৌঁছে গেলেন। যথাযোগ্য শ্রদ্ধা এবং সম্মান সহকারে সেই চাদর ও ফুল দাহ করলেন। চিতাভস্ম নিয়ে গেলেন কবীর—চেটরা বলে একটি স্থানে। সেখানে চিতাভস্ম প্রথিত করে সমাধি মন্দির তৈরি করালেন।

মগহরের নবাব বিজলি খাঁ অন্য চাদর এবং ফুল নিয়ে মগহরেই কবর দিলেন। পরবর্তীকালে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় মিলে মগহরে একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ইতিহাসবিদরা বলে থাকেন ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দ বা ১৫০৫ সংবদে অগ্রহায়ণের শুক্লা একাদশী তিথিতে কবীর দেহত্যাগ করেন।

ভারতীয় অধ্যাত্ম—সাধনার ইতিহাসে কবীর এক অবিস্মরণীয় চরিত্র। তিনি তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার মাধ্যমে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। কবীর সম্পর্কে বেশ কয়েকটি আকর গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তার মধ্যে নাভাদাসজি ভক্তমাল গ্রন্থের কথা সবথেকে আগে উল্লেখ করতে হয়। এই গ্রন্থে তিনটি অপূর্ব পদ্যের মাধ্যমে কবীরের জীবনী বর্ণনা করেছেন। কবীরের কথা বলতে গিয়ে নাভাদাসজি বললেন—

কবীর কালী রাখী নহীঁ,
বর্ণাশ্রম ষট দরসনী।

অর্থাৎ কবীর না রেখেছেন বর্ণাশ্রম আর না রেখেছেন ষড়দর্শন।

তাহলে কীভাবে তিনি পরমপুরুষ পিতার পূজার্চনা করেছেন? কবীরের সম্বল ছিল শ্রদ্ধা, ভক্তি আর সকলের প্রতি ভালোবাসা। এইগুলির জোরেই তিনি সাধনার উচ্চমার্গে উঠতে পেরেছিলেন। সর্বজীবে সমদর্শিতার জন্যই কবীর পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন।

কবীর ছিলেন এক মহাত্মা পুরুষ, তাই মৃত্যুর অনেক আগে নিজের অমরত্বের কথা বুঝতে পেরেছিলেন। একটি দোঁহার মাধ্যমে কবীর বলেছেন—

হমনি মরেঁ মরিহৈ সংসারা।
হুঁম কোঁ মিলা জিয়াবনহারা।।
হরি মরিহৈ তৌ হমহুঁ মরিহৈ।
হরি ন মরৈ হুঁম কাহে ক্কো মরি হৈ।।
কহৈ কবীর মন মনহিঁ মিলাবা।
অমর ভস্ট সুখসাগর পাবা।।

অর্থাৎ একদিন সমস্ত জগৎ সংসারের বিনাশ হবে, তবু আমার কখনো মৃত্যু হবে না। আমি কখনোই জীবনহারা হব না। কারণ হরি এবং আমার মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। হরি যদি কোনোদিন মারা যায় তাহলে আমিও মরবো। আর যদি হরির মৃত্যু না হয় তাহলে আমি কেন মহা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ব? আমার মনপ্রাণ পরমাত্মা ও হরির সঙ্গে এক হয়ে গেছে। আমি আমার সবকিছু আমার প্রিয়তম হরিকে সঁপে দিয়েছি। আমি অমর হয়ে অনন্ত সুখ সাগরে ভাসমান থাকব। হে অমৃতের পুত্র, তোমরা এসো আমার কাছে, মানুষ একে অন্যকে ভালোবাসো, হিংসা কোর না, তাহলে দেখবে যে তোমাদের জীবন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে। এক আনা দুঃখ কিংবা অভিশাপ কখনো তোমাদের স্পর্শ করতে পারবে না।

একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে দাঁড়িয়ে মনে হয় এ হল চিরন্তন ভারতআত্মার শাশ্বতবাণী। যে ভারত লুকিয়ে আছে হাজার বছর আগের কোনো তপোবনে, যে ভারত বেঁচে আছে হিমালয়ের কোনো এক কন্দরে বসে থাকা কোনো সাধকের অনিদ্রিত রাতের তপস্যায়, সেই ভারতবাণী মর্মরিত হয় কবীরের মতো এক

মহাপুরুষের উচ্চারিত অসংখ্য দোঁহাবলিতে। কবীরের মৃত্যু নেই, যতদিন মানব সভ্যতা বেঁচে থাকবে, আমরা পরম শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর দোঁহাগুলি উচ্চারণ এবং নতুনভাবে জীবনে বেঁচে থাকার দিশা খুঁজে নেব।

কবীরের দোঁহাবলি

প্রস্তাবনা

কবীরের দোঁহাবলি মধ্যযুগীয় হিন্দি সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এই দোঁহাগুলির মাধ্যমে কবীর দর্শন এবং মানবজীবনের দুরূহ বিষয়গুলির ওপর আলোকপাত করেছেন। মধ্যযুগীয় হিন্দি সাহিত্যে ভক্তিবাদ একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করেছে। মধ্যযুগের একাধিক হিন্দি কবি ভক্তিকাব্য রচনা করে অসংখ্য পাঠক—পাঠিকার প্রশংসা অর্জন করেছেন। তাঁদের কাব্যধারায় নির্গুণ এবং স্বগুণ এই দুটি রূপের প্রকাশ দেখা যায়। আচার্য রামচন্দ্র শুক্ল 'হিন্দি সাহিত্যের ইতিহাস' শীর্ষক বইতে এই জাতীয় ভক্তিকাব্যের ওপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন মুসলমান সাম্রাজ্য যখন ব্যাপকভাবে স্থাপিত হয়ে যায় তখন নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ—বিগ্রহের পাশাপাশি রাজত্বগুলির অস্তিত্বও শেষ হয়ে যায়। এই গভীর রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে হিন্দু জনসম্প্রদায় দীর্ঘকাল হতাশাচ্ছন্ন হয়ে থাকে। নিজের পৌরুষের প্রতি হতাশাগ্রস্ত জাতির জন্য ঈশ্বরের করুণা ও ভক্তির প্রতি নির্ভরশীল হওয়া ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা থাকে না সম্ভবত।

তাঁর মতে এইজন্যই বোধহয় ভক্তিকাব্যের এত পরিব্যাপ্তি চোখে পড়ে। অবশ্য অন্যান্য গবেষকরা এই বিষয়টি স্বীকার করেন নি। যেমন আচার্য হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীর মন্তব্য হল— মানুষ তার মনের মাধুরী মিশিয়ে ঈশ্বরের আরাধনা করেছে এবং এইভাবেই ভক্তিকাব্যের জন্ম হয়েছে।

এই কথা কটি মনে রেখে আমরা জ্ঞানাশ্রয়ী শাখার অন্যতম কবি কবীরের কথা আলোচনা করব। কবীর তাঁর অসংখ্য দোঁহার মধ্যে নিজের দার্শনিক অভিব্যক্তিকে সহজ সরল শব্দবন্ধে গ্রন্থিত করে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তাই আজও আমরা যথেষ্ট উৎসাহের সঙ্গে তাঁর এই দোঁহাগুলি পাঠ করে থাকি।

ভক্তমালের রচয়িতা নাভাদাস কবীরের সংস্কারবাদী দৃষ্টি এবং বিরোধী চিন্তা ও প্রথাগত বিচারধারা স্পষ্ট বর্ণনা করেছেন। এই গ্রন্থটি ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে লিখিত হয়েছে বলে ধরা হয়। নাভাদাস তাঁর ষটপদীতে কবীরকে রামানন্দের অন্যতম শিষ্য হিসাবে উল্লেখ করেছেন। কবীরের বাণী তখনকার দিনে অনেক মানুষকেই প্রভাবিত করেছিল। যেমন শিখ সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ 'গ্রন্থসাহেব'—এ তাঁর বাণীর কিছু অংশ সংকলিত আছে। গুরু নানকজির রচনায় কবীরের জাত এবং তাঁর রচনার সংকেতও পাওয়া যায়। এখানে বলা হয়েছে যে, কবীর জোলা পরিবারে লালিত পালিত হয়েছিলেন।

স্বয়ং তুকারামও তাঁর লেখায় কবীরের উল্লেখ করেছেন। পাশ্চাত্য লেখকদের মধ্যে মৈকালিফ, উইলসন, ফহরক খুহর নানা আলোচনা করেছেন কবীরের। দোঁহা নিয়ে গবেষণা করেছেন ড. ভান্ডারকার, ড. রামকুমার ভার্মা, আচার্য হাজারীপ্রসাদ ত্রিবেদী, বাবু শ্যামসুন্দর দাস, ড. রামপ্রসাদ ত্রিপাঠী, ড. বড়ঙ্কল প্রমুখ। ড. শ্যামসুন্দর দাস বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কবীরের দোঁহার বিচার করেছেন।

এই ক—টি কথা মনে রেখে আমরা কবীরের দোঁহার ওপর আলোকপাত করব। তবে এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে। তা হল কবীর কিন্তু জীবনে কখনো অক্ষরজ্ঞান লাভ করার কোনো সুযোগ পাননি। তিনি পুস্তকের বিদ্যায় বিশ্বাস করতেন না। প্রভুত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হওয়ায় তিনি ছিলেন অগাধ জ্ঞানের অধিকারী। সৎসঙ্গ, মনীষীবিদ্যা, পণ্ডিতদের সঙ্গে আলাপচারিতা এবং নিজের ঈশ্বরীয় অনুভবের মাধ্যমে তিনি যে বৌদ্ধিক চেতনা অর্জন করেছিলেন তা কেতাবি জ্ঞানের থেকেও উচ্চতর। ব্যবহারিক দৃষ্টিতেও তা ছিল যথেষ্ট উপযোগী। কবীরের ছিলেন না কোনো শিক্ষাগুরু। কিন্তু তাঁর দীক্ষাগুরু কে? অনেকেই মনীষী স্বামী রামানন্দকে কবীরের গুরু বলে মানতে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ সমীক্ষক এবং কবীরের দোঁহার অধ্যয়নকারীরা স্বামী রামানন্দকেই তাঁর মন্ত্রগুরু হিসাবে মেনে নিয়েছেন।

কবীর তাঁর চিন্তাধারা প্রচার করার জন্য কোনো পন্থ, মতবাদী, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেছিলেন? যাঁরা কবীরের চিন্তাধারায় প্রভাবিত হতেন বা যারা তাঁর কাছে আসতেন তাদের ওপর স্বাভাবিকভাবেই কবীরের প্রভাব পড়ত। তাঁদের মধ্যে ধর্মদাস এবং সুরত গোপাল বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁরা কবীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁর চিন্তাধারা প্রচার করেন। কবীরের মৃত্যুর পর ধর্মদাস ছত্তিশগড়ে কবীরপন্থীদের শাখা সঞ্চালক

হয়েছিলেন। সুরত গোপাল কাজি শাখার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে সমস্ত উত্তর—পূর্ব ভারতে কবীরপন্থীদের অসংখ্য মতাবলম্বীরা ছড়িয়ে পড়েন।

কবীর তাঁর দোঁহাবলির মাধ্যমে সমাজে পরিব্যাপ্ত দুরাচার, শঠ, কপটতা, অন্ধ বিশ্বাস এবং মূর্খ মৌলবাদের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতো এমন বিরোধিতা আগে তো কেউ করতে পারেননি, পরেও কেউ করেননি। কবীরের নিজের আচরণ এবং আত্মগরিমার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। তাই বোধহয় তিনি এত সাহসের সঙ্গে নির্ভীকভাবে সমস্ত ধার্মিক ভণ্ডামির বিরুদ্ধে তীব্র আঘাত করতে পেরেছেন। কবীরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নৈতিকতা, স্পষ্টবাদিতা, সাহস এবং দৃঢ়তা ভীষণভাবে পরিলক্ষিত হয়। এর পাশাপাশি তাঁর মধ্যে ছিল বিনয়, সরলতা, পরদুঃখকাতরতা, বৈরাগ্য এবং সকল মানুষের প্রতি সমভাবাপন্নতা। হিন্দু এবং মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের অসংখ্য মানুষ তাঁর অনুগামী হয়েছেন। কবীর কখনো আপোষবাদী মনোভাবে বিশ্বাস করতেন না। নিজের নির্ধারিত সিদ্ধান্তে দৃঢ়তার সঙ্গে অটল থাকাই হল এক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির ভূষণ। কবীর এই মর্যাদায় বিশ্বাস করতেন। তাই তিনি বলেছেন—

হম ঘর জাল্যা আপনা লিয়া মুরাথা
জাল্যোঁ দাশ যো চলে হামারি সাথ

অর্থাৎ আমি আমার নিজের ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছি। অর্থাৎ ত্যাগ করে এসেছি এবং একটি সম্পর্ক নিয়ে এগিয়ে চলেছি। আমার সঙ্গে সেই চলতে পারে যে নিজের ঘর সংসার ছাড়তে পারে। অর্থাৎ যে স্বার্থত্যাগ করার ক্ষমতা রাখতে পারে।

কবীরের দোঁহাগুলি পাঠ করলে একটি পরস্পর বিরোধী দিক আমাদের কাছে পরিস্ফুটিত হয়। তাঁর প্রখর তেজস্বী অন্ধবিশ্বাস বিরোধী প্রথা, বিধ্বংসী সমাজ সংস্কারকের চেতনা আবার বিনীত সন্ত ভক্ত জ্ঞানী মনীষী পরোপকারী ও মানবতাবাদী চেতনা—এই দুটি রূপের মধ্যে কবীর এক সামঞ্জস্য প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। শাস্ত্র বিরোধিতাকে খণ্ডন করার সময়ে তিনি হতেন উগ্র ও সুতীক্ষ্ন। কোনো দীনহীন অসহায় মানুষকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দয়ালু হয়ে উঠতেন। তিনি তাঁর দোঁহার মাধ্যমে ক্রোধ, লোভ, মদ, মাৎসর্য ও ঈর্ষা থেকে নিজেদের রক্ষা করার কথা বলতেন।

কবীর জনসাধারণকে উপদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে ছোটো ছোটো বাক্যবন্ধের ওপর নির্ভর করতেন। কবীরের মুখে মুখে বলা এইসব দোঁহাগুলি পরবর্তীকালে কবীরপন্থী ভক্তরা 'বীজক' নামক গ্রন্থে সংকলিত করেন। কবীরের 'বীজক' তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগকে বলে শাস্বী। যেখানে নীতিকথামূলক কবিতা আছে। দ্বিতীয়টি হল পদ। অর্থাৎ ভজন বা ঈশ্বর ভাবনা এবং তৃতীয়টি হল রৈমনি বা ভক্তিগীতি। কোন কোন বাণী সংকলনে ভজনকে স্থান দেওয়া হয়েছে? অধ্যাপক উইলসন অনেক পরিশ্রম করে কবীরের আটটি গ্রন্থের হিসেব দিয়েছেন। ওয়েসকট বিরাশিটি গ্রন্থের স্বীকৃতি দিয়েছেন। মিশ্র বন্ধুরা বলেন কবীর পঁচাত্তরটি গ্রন্থের রচয়িতা। আবার আর—এক গবেষক ঊনচল্লিশটি গ্রন্থের প্রাধান্য দিয়েছেন। সংখ্যার এই বিভিন্নতায় প্রমাণিত হয় কবীর সত্যি সত্যি কী ধরনের সাহিত্যসম্ভার সৃষ্টি করেছেন যা আজও যথেষ্ট বিতর্কের মধ্যে আছে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে কবীরের সাহিত্য সৃষ্টির সমগ্র রূপরেখাটি এখনও আমাদের কাছে পরিস্ফুটিত হয়নি।

কবীরের গীতিকথনমূলক কবিতা অর্থাৎ সংগীতে আছে উপদেশ, গীতিকথা, গুরু মহিমা, কীর্তন ভাবনা, জ্ঞান সাবধানবাণী। কাব্যের দিক থেকে এই জাতীয় কবিতা এবং সংগীত বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা জানি এগুলির মূল্য অপরিসীম। কারণ এইসব দোঁহাগুলি বংশ পরম্পরায় শ্রুত হতে হতে মানুষের মনে স্থায়ী ছাপ রেখে যায়।

এই কটি কথা মনে রেখে আমরা কবীরের নির্বাচিত কিছু দোঁহার ওপর বিশ্লেষণাত্মক আলোকপাতের চেষ্টা করব।

নির্বাচিত দোঁহা

জল মে কুম্ভ, কুম্ভ মে জল হ্যায়,

বাহির ভিতর পানি।
ফুটা কুম্ভ জল জলহি সমনো,
য়হু তত কথো গিয়ানী।।

ব্যাখ্যা : কবীর ছিলেন এক ভক্তিবাদী মহাসাধক। তাঁর ঈশ্বরানুধ্যানে ভক্তিবাদের সঙ্গে নাথতন্ত্রের যোগবাদের সংমিশ্রণ চোখে পড়ে। এই দ্বিবিধ সত্তার সার্থক উন্মোচন ঘটেছে কবীরের একাধিক দোঁহায়, এইসব দোঁহাকে রহস্যবাদী দোঁহা বলা হয়। যে রহস্যবাদের জন্য কবীর বুদ্ধিজীবী মহলে খ্যাতি এবং যশ অর্জন করেছিলেন। সেই রহস্যবাদের প্রচ্ছন্ন এবং প্রত্যক্ষ বহিঃপ্রকাশ এই শব্দবন্ধের মূল আকর্ষণ। এই দোঁহার মাধ্যমে কবীর বলতে চেয়েছেন যে, মায়ার জন্যেই পরমাত্মা অর্থাৎ ঈশ্বরের নাম এবং রূপের অস্তিত্ব অনুভূত হয়। মানুষ হল মায়াবদ্ধ জীব। মায়ার অঞ্জন চোখে রেখে সে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রত্যক্ষ করে। মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন জীব বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আসক্তিবোধ প্রকাশ করে। যদি আমরা একবার এই মায়ার বাঁধন থেকে মুক্তি পাই তাহলে আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে সাযুজ্য সংস্থাপিত হবে।

আত্মা এবং পরমাত্মা হল এক মহান শক্তির দুটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এদের মাঝে আছে মায়ার পর্দা। তাই আমরা আত্মা এবং পরমাত্মাকে পৃথক সত্তা বলে জ্ঞান করি। নিরন্তর উপাসনা এবং বুদ্ধি জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে যদি একবার মায়ার এই অলীক বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে দুটি ভাগ এক হয়ে যাবে।

এই দোঁহাকে কবীর একটি ব্যবহারিক উদাহরণ সহযোগে ওই দুর্জ্ঞেয় রহস্যবাদকে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন—কলসীর ভেতরের জল আর বাইরের জল একই। যেহেতু কলসীর মধ্যে একটি পাতলা আবরণ আছে তাই দুটি জলের মিলন ঘটছে না। ঠিক এইভাবে মায়া ব্রহ্মের ওই স্বরূপের মধ্যে বিভাজন রেখা সৃষ্টি করে। কলসী ভেঙে গেলে দুটি জল মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। তখন আর তাদের পৃথক সত্তা থাকে না। মায়ার আবরণ ভেঙে গেলে আত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে কাঙ্ক্ষিত মিলন সংঘটিত হয়। এইভাবে কবীর তাঁর অদ্বৈতবাদকে রহস্যবাদের আধারে উন্মোচিত করেছেন।

হরি হরি ম্যায় তো হম হুঁমরি হ্যায়!
হরি ন মরৈ হম কাহে কো মরি হ্যায়।।

এই দোঁহাটিও কবীরের রহস্যবাদী চিন্তনদ্বারা প্রসূত। এই দোঁহার মাধ্যমে কবীর বোঝাতে চেয়েছেন যে, কখন কীভাবে আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে ঘনিষ্ঠ মিলন ঘটে। তখন একটির বিনাশ ঘটলে অপরটিরও বিনাশ ঘটে যায়। একটির অস্তিত্বের মধ্যে অন্যটির অস্তিত্ব সার্থক স্ফুরণ সৃজনাত্মক হয়ে ওঠে। কবীর বলেছেন হরির মৃত্যু মানে তাঁর মৃত্যু। অর্থাৎ তাঁতে এবং হরিতে কোনো বিভেদ নেই। হরি অর্থাৎ ঈশ্বরের বেঁচে থাকার অর্থ আমাদেরও বেঁচে থাকা। ঈশ্বরের সঙ্গে নিজের সমস্ত সত্তাকে একীভূত করার এই চিন্তনের মধ্যেই রহস্যবাদ প্রকাশিত হয়ে থাকে।

লালী মেরে লালকা, জিত দেখৌ তিত লাল,
লালী দেখন ম্যায় গঈ, ম্যায় ভী তো হোঈ লাল।।

এই দোঁহার মাধ্যমে কবীর ঈশ্বরের অপার মহিমার কথা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। কবীর অনুভব করতেন যে, স্থল—জল—অন্তরীক্ষ সর্বত্র ঈশ্বর বিদ্যমান! তিনি বলেছেন ঈশ্বরের উপস্থিতি সবদিকে। আমরা যেদিকেই তাকাব সেদিকেই ঈশ্বরকে দেখতে পাব। সর্বত্র বিরাজমান এই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করতে করতে কবীর কখন যেন তাঁর অংশ হয়ে গেছেন। ঈশ্বরের ব্যক্তিত্বে লীন হয়ে গেছে তাঁর সমস্ত সত্তা। এখন আর তিনি ঈশ্বরের থেকে নিজেকে ভিন্ন করতে পারবেন না।

নিন্দক নিয়রে রাখিয়ে, আঁগন কুটী দ্বায়।

বিন পানি সাবুন বিনা, নির্মল করে সুভাষ।।

কবীর এই দোঁহায় বলেছেন যে নিন্দুককে কখনো দূরে সরিয়ে রাখতে নেই। তাকে বাড়িতে আশ্রয় দিতে হয়। কারণ সমালোচক না থাকলে তোমার দোষত্রুটি কে ধরবে? পৃথিবীতে কোনো মানুষ ত্রুটিমুক্ত হয়ে বেঁচে থাকতে পারে না। সকলের মধ্যেই কিছু না কিছু দোষ—ত্রুটি থাকবেই। তাই আমাদের উচিত সেই দোষগুলিকে পরিশুদ্ধ করা। এখানে কবীর একটি ব্যবহারিক উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, জল এবং সাবান ছাড়া যেমন জামাকাপড় পরিষ্কার হয় না, নিন্দুক এবং সমালোচক ছাড়া তেমনি আমাদের ত্রুটিগুলিও উৎপাটিত হয় না। তাই আমরা আমাদের স্বার্থেই নিন্দুক এবং সমালোচকদের কাছে ডেকে নেব। লোকলজ্জার ভয়ে তাদের দূরে সরিয়ে দেব না।

সন্তো রাহ দোউ হম দীঠা।
হিন্দু তুছক হটা নহিঁ মাঝে,
স্বাদ সবনকো মীঠা।।
হিন্দু বরত একাদসি সাধৈ,
দুধ সিংঘাড়া সেতী।
অনকো ত্যাগৈ মন নহি হটকৈ,
পারন করৈ সগোতী।।
রোজা তুরক নমার গুজারৈ,
বিসমিল বাঁগ পুকারৈ।
উনকো ভিস্ত কহাঁ তে হোই হ্যায়,
সাঁঝে মুরগি মারৈ।।
হিন্দু দয়া মেহরকো তুরূকন,
দোনোঁ ঘট্ সোঁ ত্যাগী।
বৈ হলাল বৈ ঘটকা মারৈ
আগি দুনৌ ঘর লাগী।।
হিন্দু তুরূক কী এক রাহ হ্যায়,
সতগুরু হহৈ বতাঈ।
কহহি কবীর সুনো হো সন্তো,
রাম ন ক হৈউ খোদাঈ।।

কবীর যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন সমগ্র উত্তর ভারতে হিন্দু এবং মুসলমান এই দুই ধর্মেরই প্রভাব ছিল। তিনি ওই দুটি ধর্মের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিকগুলিকে ভালোভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। এই দুই ধর্মের যেসব মধ্যযুগীয় কুসংস্কার আছে সেগুলির বিরূপ সমালোচনা করেছেন। এই দীর্ঘ দোঁহার মাধ্যমে কবীরের সেই সমালোচনাই প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেছেন— আমি দুটি পথ দেখেছি। একটি পথ হিন্দুরা অনুসরণ করে, অন্যপথে মুসলমানরা গমন করে। এই দুটি ধর্মমত শেষপর্যন্ত একই গন্তব্যে গিয়ে মিশে গেছে। হিন্দুরা একাদশীর দিন ভাত খায় না, দুধ এবং সিঙ্গারা খেয়ে থাকে। আর এদিকে মুসলমানরা রোজার মাসে সারাদিন উপোস করে সন্ধ্যাবেলা খাওয়া দাওয়া করে। সন্ধ্যাবেলা মুরগি মারলে তারা স্বর্গে যাবে কীভাবে? হিন্দু এবং মুসলমান উভয় মানুষের মন থেকে দয়া, মায়া, ভক্তি, করুণা, ভালোবাসা লুপ্ত হয়ে গেছে। সেইসব মানুষের বেঁচে থাকা উচিত নয়। এদের ঘরে যেন আগুন লাগে। মুসলমানরা পোচ মেরে পশু হত্যা করে। আর হিন্দুরা এক ঝটকা মেরে হত্যা করে। কেউই রাম বা খোদাকে চায় না।

এই দোঁহাটি পড়লে আমরা বুঝতে পারি যে কবীর ছিলেন সর্বধর্ম সমন্বয়ের শাশ্বত প্রতীক। তিনি চেয়েছিলেন হিন্দু এবং মুসলমান ধর্মের মধ্যে যেসমস্ত অন্ধকার দিক আছে সেগুলি যেন চিরতরে বিনষ্ট হয়। এই দুটি ধর্ম আবার যেন তাদের স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

হরি রস পীয়া জানিয়ে,
কবহুঁ ন জায় ঘুমার,
ম্যায় মনতা ঘুমত ফিরৈ,
নাহী তন কী সার।।

সন্ত কবি সুফী মতবাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। একসময় ভারতবর্ষের অনেক দরদি বা মরমী সাধক সাধিকা সুফী মতবাদকে আত্মস্থ করেছিলেন। সুফী মতবাদের মধ্যে চিরন্তন মানবিকতার জয়গান গাওয়া হয়েছে। এই ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কবীর একাধিক মনে রাখার মতো দোঁহা রচনা করেন। এই দোঁহাটি সুফী মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত। সুফী চিন্তায় প্রেমের মধ্যে নেশাই প্রধান। এই দোঁহায় কবীর অনায়াসে বলেছেন, ঈশ্বর চিন্তারূপী রস একবার পান করলে অন্য কোনো নেশা আর মনে ধরে না। এইভাবেই তিনি ঈশ্বরভক্তিকে এক নেশার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

পানি হি তে হিম ভয়া,
হিম হি গয়া বিলায়।
কবিরা কো থা সোইভয়া,
অব কুছ কহা ন জায়।।

এই দোঁহার মাধ্যমে কবীর আত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে যোগসূত্রতা রচনা করেছেন। কবীর বলেছেন, জল থেকে বরফ হয় আবার বরফ গলে জল হয়ে যায়। এই প্রাকৃতিক ঘটনা নিরন্তর চলতেই থাকে। এই ধারাবাহিকতার মধ্যে এক দার্শনিক সত্তা এবং দার্শনিক সত্য লুকিয়ে আছে। এই পদ্ধতিতেই আত্মা শরীররূপ ধারণ করে। আবার শরীর ছেড়ে পরমাত্মায় বিলীন হয়ে যায়। কবীর বলেছেন, এটি হল তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার অনুভূতি। এছাড়া অধিক কোনো কিছু জ্ঞান আর তাঁর দরকার নেই।

সমঝৈ তো ঘরমে রহৈ,
পরদা পলক লগায়।
তেরা সাহিব তুজ্মেঁ,
অনত কহুঁ মত জায়।।

কবীর বলেছেন, তুমি যদি মনে করো ঈশ্বর তোমার মধ্যে আছেন, তাহলে তুমি চোখের পাতারূপী পর্দা টাঙিয়ে ঈশ্বরের ভজনা করতে। তাহলে তুমি তাকে ঠিক পেয়ে যাবে। কবি ছিলেন এক ভক্তিবাদী মহাসাধক। তিনি বিশ্বাস করতেন ভক্তিবাদের অশ্রু দিয়ে ঈশ্বরের চরণ বন্দনা করলে ঈশ্বর সদা—সর্বদা প্রসন্ন হন। এই দোঁহার মধ্যে কবীরের ভক্তিবাদী চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে।

জাকো রাইখ সাঈয়াঁ,
মারিন সক্কৈ কোয়।
বাল ন বাঁকা করি সকৈ,
জো জ্যা বৈরী হোয়।।

কবীরের বিশ্বাস ঈশ্বর যার রক্ষক তাকে কেউ কোনোদিন হত্যা করতে পারবে না। যদি সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ সেই লোকটির বিরোধিতা করে, তাহলেও তার কিছু হবে না। কারণ তাঁর সঙ্গে ঈশ্বরের অপার করুণা বিরাজমান আছে। কবীর ঈশ্বরের প্রতি কতখানি অনুরক্ত ছিলেন তার প্রমাণ আছে এই দোঁহাটির মধ্যে।

সমদৃষ্টি সতগুরু কিয়া,
মেট ভরম বিকার।
জহঁ দেখেই তহঁ এক হা,
সাহেব কা দীদার।।

এই দোঁহায় কবীর তাঁর সৎগুরুর করুণার কথা উচ্চারণ করেছেন। কবীর বলেছেন—গুরু তাঁকে সমদৃষ্টি প্রদান করেছেন। যেহেতু গুরু ছিলেন সমস্ত সাম্প্রদায়িক হানাহানির ঊর্ধ্বে, তাই পৃথিবীর সকল মানুষকে তিনি একই চোখে দেখতেন। তাঁর কাছে ধনী—দরিদ্র, উঁচু—নীচু, নারী—পুরুষ কোনো বিভেদ ছিল না। এই দৃষ্টিলাভের ফলে মনের সমস্ত ভ্রম কেটে যায়। বিকারের অবসান ঘটে। মানুষকে আমরা কেন মিছামিছি ছোটো এবং বড়ো এই দুটি ভাগে ভাগ করব। আমরা যেদিকে তাকাব সেদিকেই ঈশ্বরকে দেখতে পাব। কবীরের মনের ঘরে ঈশ্বর এবং মানুষ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

আতম অনুভব জ্ঞানকী,
জো কোঈ পূছে বাত।
সো গূঁগা গুড খাইকৈ,
কহৈ কোনো মুখ স্বাদ।।

কবীরদাস বলেছেন—মানুষ আত্ম—সাক্ষাৎকারের জ্ঞান লাভ করেছে, সেই মানুষের কাছে আর অন্য কোনো জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। মানুষের মধ্যে অসীম শক্তি লুকিয়ে আছে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য মানুষ তার এই অন্তর্নিহিত শক্তির পরিব্যাপ্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। যখন মানুষের মধ্যে এই উপলব্ধি হবে তখন মানুষ যে—কোনো কঠিন কাজ সহজেই সুসম্পন্ন করতে পারবে। তবে কী শক্তিকে আমরা শুধুমাত্র অনুভব করতে পারি, শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করতে পারি না! বোবা মানুষ যেমন মিষ্টি খেয়ে মিষ্টির স্বাদ নিজে উপলব্ধি করে অথচ কাউকে তার মনের আনন্দের কথা বলতে পারে না, ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হবার পর একজন ভক্তিবাদী মানুষও সেই অনুভূতির কথা অন্যের কাছে প্রকাশ করতে পারবে না।

কবীরের দোঁহার বৈশিষ্ট্য হল তিনি দৈনন্দিন দিন—যাপনের নানা জনপ্রিয় ঘটনা বিবৃত করে দর্শনের এক—একটি দিককে উদ্ভাসিত করেছেন। এই দোঁহার মধ্যে তাঁর এই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

হীর রূপ সতনাম হ্যায়,
নীর রূপ ব্যবহার।
হংস রূপ কোঈ সাধু হ্যায়,
ততকা ছাননহার।।

হাঁস যেমন জল থেকে দুধকে আলাদা করতে পারে, সংসারে থেকে এক জ্ঞানী পুরুষ সেইভাবে সংসারের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বরের আরাধনা করতে পারেন। কবীর বলেছেন, ঈশ্বরের নাম হল দুধের মতো। আর, মানুষের ব্যবহার হল জলের মতো। মানুষ মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। ঈশ্বরের করুণা উপলব্ধি করতে পারে না। বিষয়—আশয়ের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি প্রকাশ করে। হংসরূপী কোনো সাধু যখন সাংসারিক

মায়া, মমতার বন্ধন থেকে ঈশ্বরজ্ঞানকে পৃথক করেন, তখন তাঁর মন অনাস্বাদিত আনন্দে প্লাবিত হয়। তিনি উপলব্ধি করেন যে এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের মহিমা অপার এবং অমর।

জৈসে জলহি তরঙ্গ তরঙ্গিনী,
অ্যায়সে হম দিখলা বহিঁগো।
কহৈ কবির স্বামী সুখ সাগর,
হসসি হংস মিলবাহিঁগে।।

কবীরদাস সেইসব মানুষকে অত্যন্ত সুখী এবং সমৃদ্ধ বলে মনে করেন। যারা নিজের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে অন্য এক অস্তিত্বের অংশ হয়ে যায়। দর্শনশাস্ত্রের এই গূঢ় বিষয়টিকে কবীর ব্যবহারিক উদাহরণ সহযোগে পরিস্ফুটিত করেছেন। তিনি বলেছেন, সমুদ্রের তরঙ্গ সমুদ্রের বুকে সৃষ্টি হয়ে আবার সমুদ্রে মিশে যায়। প্রভুভক্তিরূপী সাগরের সঙ্গে মিলিত হয়েও আমরা এইভাবে আনন্দিত হয়ে উঠি। ঈশ্বরের প্রতি কতখানি আনুগত্য, প্রেম, ভক্তি এবং ভালোবাসা থাকলে তবে এমন অনুধ্যান তা সহজেই অনুমেয়।

কবির তেজ আনন্দ কা
মানো ঊগী সূরজ সেনি।
পতি সঙ্গ জাগী সুন্দরী
কৌতুক দীখা তেনি।।

কবীর নানাভাবে সুফী মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। সুফীপন্থীরা জগৎ সংসার সৃষ্টি সম্পর্কে নিজস্ব ধারণা এবং উপলব্ধির কথা বারে বারে ব্যক্ত করেছেন। এই বিষয়ে কবীর সমমত প্রকাশ করেছেন। তবে সুফীরা মোক্ষ সংক্রান্ত যে বিচারধারায় বিশ্বাসী ছিলেন, কবীর তার সবকটিকে অবশ্য পালনীয় বলে মনে করেননি। সুফীরা নৈতিক আচরণের ওপর জোর দিতেন। তাঁরা বলতেন—শরীর এবং মন সম্পূর্ণ পবিত্র না হলে ঈশ্বর—অনুধ্যান সম্ভব নয়। এই দোঁহাতে সুফী মতবাদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আবার অনেকে বলে থাকেন, এই দোঁহার মধ্যে দিয়ে কবীর তাঁর বৈষ্ণব ভাবনার কথাই পরিস্ফুটিত করেছেন। বৈষ্ণবরাও শরীর এবং মনের শুদ্ধতাকে ঈশ্বরানুভূতির একান্ত প্রয়োজনীয় অংশ হিসাবেই মনে করে থাকেন।

কবির বাদল প্রেমকা,
হম পর বরসা আই,
অন্তর ভোগী আত্মা,
হরী ভঙ্গ বনরাই।।

কবীরের দার্শনিক চিন্তাধারার ওপর প্রেম এবং ভক্তিবাদের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল। এই দোঁহাতে সেই প্রভাবের কথাই বলা হয়েছে। কবীর বলেছেন, প্রেমের বাদলধারা আমাদের ওপর বর্ষিত হলে ভোগী মানুষের অন্তঃস্থলে বনরাজির মতো হরি বিরাজ করতে থাকেন। অর্থাৎ হরি প্রেমময়। তিনি এক আনন্দঘন সত্তা। তাঁর কাছে গেলে কোনো মানুষ আর নিরানন্দ অবস্থায় থাকতে পারে না।

কহৈঁ কবির হরি দরস দিখায়ো।
হমহিঁ বুলাবো কী তুম চল আয়ো।।

কবীরদাস বলেছেন, আমাদের ঈশ্বরের দর্শন দাও। ঈশ্বরকে দেখতে না পেলে জীবন বৃথা। তাই তাঁর একান্ত প্রার্থনা—হে প্রভু, তুমি আমার ওপর দয়া এবং করুণা বর্ষণ করো। আমি যেন অন্তত একবার তোমাকে চোখের সামনে দেখতে পাই।

হমারে রাম রহিম করিম
কেসো অলহ রাম সতি সোঈ।
বিসমিল মোটি বিসম্ভর একৈ,
ঔর ন দূজা কোঈ।।

এই দোঁহার মধ্যে সুফীতত্ত্বের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কবীর হিন্দু এবং মুসলমান ধর্মের মধ্যে ব্রহ্ম ঐক্য স্থাপনের কথা বারবার বলে গেছেন। তাই তিনি ভারতীয় ব্রহ্মবাদের ভিত্তিতে রাম, রহিম, বিসমিল, বিশ্বম্ভরকে এক ও অভিন্ন বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন—এঁরা হলেন ব্রহ্মের বিভিন্ন রূপ, এঁদের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই।

নৈনা নীরুর লাইয়া,
রহট বসৈ নিস জাম
পাপিহা জিঁউ পিব পিব করৌ
কবরে মিলহুতো রাম।।

কবীরের এই দোঁহাটির মধ্যে আধ্যাত্মিক প্রেমের কথা বিবৃত হয়েছে। এই দোঁহাটি পাঠ করলে আমরা বুঝতে পারি কবীরের চোখে রাম ছিলেন এক পরম পুরুষ। পিউকাঁহা পাখি যেমন সবসময় পিব পিব করে, ঠিক সেইরকমভাবে কবীর তাঁর প্রিয়তম রামের নাম জপ করে চলেছেন। কবীরের স্থির বিশ্বাস একদিন তিনি রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ পাবেন।

গুরুপ্রেম কা অঙ্ক পঢ়ায়দিয়া
অবপয়নে কো কুছ নহিঁ বাকি।

এই দোঁহার মধ্যে কবীরের ভক্তিরস প্রকাশিত হয়েছে। কবীর বিশ্বাস করেন জীবনে গুরু পরম আদর্শস্থানীয় ব্যক্তি। সৎগুরুর সন্ধান পেলে আমরা জীবন—সমুদ্রকে অতিক্রম করতে পারব। যে ব্যক্তি এমন গুরুর সন্ধান পেয়েছেন, তাঁর আর অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই। মনে করতে হবে যে সেই ব্যক্তির সব অধ্যয়ন শেষ হয়ে গেছে। কবীর সবকিছুর ওপরে গুরুপ্রেমকে স্থান দিয়েছেন।

হরি মেরা পীব মাই,
হরি মেরা পীব
হরি বিন রহিন
সকৈ মেরা জীব।।

এই দোঁহাটির মধ্যে সুফীবাদের প্রচ্ছন্ন প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এখানে কবীর সুফীভাবে উজ্জীবিত হয়ে প্রেম এবং দাম্পত্য সংযুক্তির কথা ঘোষণা করেছেন। সুফীবাদীরা মনে করেন প্রেমের চরম প্রকাশ ঘটে দাম্পত্য জীবনে। স্বামী এবং স্ত্রীর পারস্পরিক ভালোবাসা আনুগত্যের মাধ্যমে সংসারসমুদ্র পার হয়ে যান। এখানে সাধক এবং পরমাত্মা সম্পর্ক স্বামী—স্ত্রীর মতো। সুফীদের এই মতবাদকে অনুসরণ করে কবীরও রামের সঙ্গে হরির সঙ্গে স্বামী—স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপন করেন। এই দোঁহাটির মাধ্যমে কবীর তাঁর সুফীকেন্দ্রিক মতবাদকেই ব্যক্ত করেছেন।

অল্লা রাম কী কম নহীঁ
তহাঁ কবির রহা ল্যৌ লায়।।

কবীর দুঃখের সঙ্গে লক্ষ করেছেন যে, হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেকে একে অন্যের সঙ্গে বৈরী সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁরা সাম্প্রদায়িক সংহতিকে নষ্ট করেছেন। ভবিষ্যতে যাতে দেশে এমন সংঘর্ষের ঘটনা না ঘটে তাই কবীর রাম ও রহিমের নামকে একীভূত করতে চাইছেন। তিনি নাম রহিত নিরাকার ব্রহ্মকেই তাঁর জীবনের উপাস্য বলেই মনে করেন।

গুরু চরণ লাগি হম বিনবতা,
পুছত কহু জীউ পাইয়া।
কবন কাজি জগ উপজৈ,
বিনসৈ কহু মোহি সমঝাইয়া।।

এই দোঁহার দর্পণে প্রতিফলিত হয়েছে কবীরের জ্ঞান চর্চার বিভিন্ন দিক। কবীর তাঁর গুরুর কাছে আবেদন করেছেন—হে গুরু, আপনি অনুগ্রহ করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অপার রহস্যের কথা আমার কাছে বিবৃত করুন। গুরুর চরণ ধরে অতি বিনয়ের সঙ্গে কবীর বলছেন—হে প্রভু, আমাকে বলুন এ জীবন আমি কীভাবে পেলাম। এই জীবনরহস্য আমি উপলব্ধি করতে পারছি না। তাই সদাসর্বদা আমার মনে নানা আশঙ্কার জন্ম হচ্ছে। হে প্রভু, আপনি আমাকে এই ঝড়—ঝঞ্ঝার রাতে নিরাপদ আশ্রয় দিন।

হম সব মাঁহি সকল হম মাঁহী,
হম হেঁ ঔর দূসরা নাহীঁ।
তিন লোক মে হমারা পসারা,
আবাগমন সব খেল হমারা।
ঘট দরশন কহিয়ত ভেখা,
হমহী অতীত রূপ নহী দেখা।
হম স্ত্রী আপ কবির কহাবা,
হম হী অপনা আপ লখাবা।

কবীর বলছেন—আত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে যখন কাঙ্ক্ষিত মিলন ঘটে তখন সাধকের এমন এক উপলব্ধি হয়। তখন তিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুর মধ্যে নিজেকে এবং নিজের মধ্যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুকে প্রত্যক্ষ করেন। তিনি আর গার্হস্থ্য জীবনের প্রতি সামান্যতম মোহ বা ভালোবাসা প্রদর্শন করতে পারেন না। সাধারণ গৃহস্থ মানুষ অবশ্য এই সাধকের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে না পেরে তাঁকে উন্মাদ বলে মনে করেন। হায়, এইসব মানুষেরা কী করে সাধনার গূঢ় তত্ত্বগুলিকে অনুধাবন করবেন!

কবির জাগ্যা হী চাহিয়ে।
কেয়া গৃহ কেয়া বৈরাগ্য।।

কবীর ছিলেন এক বৈরাগী। কিন্তু বৈরাগী হওয়া সত্ত্বেও তিনি সংসারত্যাগী ছিলেন না। ঈশ্বরের সাধন ভজন করার জন্য তিনি অরণ্য অভ্যন্তরে প্রবেশ করেননি অথবা পর্বতের কোনো গুহার মধ্যেও নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি। তিনি নিজ পরিশ্রমে অর্জিত অর্থের দ্বারা কায়ক্লেশে জীবিকা নির্বাহ করতেন। সংসারের মধ্যে থেকেও তিনি সংসারের সবকিছুর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েননি। তিনি মনে করতেন, সংসারেই থাকো আর সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন করো, জ্ঞান থেকে কখনো নিজেকে বঞ্চিত কোরো না।

পাহন পূজৈ হরি মিলেঁ
তো ম্যায় পূজুঁ পহার।

কবীর মূর্তিপূজার বিরোধী ছিলেন। একাধিক দোঁহার মাধ্যমে তিনি পৌত্তলিকতাবাদকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন। তিনি বলেছেন—যদি পাথর পুজো করলে আমরা ঈশ্বরের সান্নিধ্য পাই, তাহলে আমি পাহাড়

পুজো করব। পাথর খণ্ডের থেকে পাহাড় অনেক বড়ো। পাহাড় পুজো করলে অনেক তাড়াতাড়ি আমরা ঈশ্বরকে অনুভব করতে পারব। এইভাবে তিনি যুক্তিতর্ক দিয়ে মূর্তিপূজার বিরোধিতা করেছেন।

জাকে মুঁহ মাথা নহী,
নাহীঁ রূপ অরূপ,
পুহুপ বাস তেঁ পাতরা,
অ্যায়সা তত্ত্ব অনূপ।।

এই দোঁহার মাধ্যমে কবীর ব্রহ্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। যেহেতু তিনি ছিলেন মূর্তিপূজার বিরোধী তাই তাঁর কাছে ব্রহ্মই হলেন অবিনশ্বর সত্তা। হিন্দুধর্মের মধ্যে নানা ধরনের কুসংস্কার ঢুকে গিয়েছিল। এর ফলে সনাতন হিন্দুধর্মের গৌরব এবং মাহাত্ম্য অনেকাংশে খর্ব হয়। কবীর তাই তাঁর মনের দুঃখ—ব্যথার কথা প্রকাশ করেছেন। কবীর ছিলেন একেশ্বরবাদী। ব্রহ্মের প্রতিই ছিল তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি এবং ভালোবাসা। তিনি বলেছেন—আমার ব্রহ্মের কোনো রূপ নেই, দেহ নেই। ফুলের মধ্যে যেভাবে সুগন্ধের অবস্থান, সেভাবেই সর্বত্র ব্রহ্মের অবস্থান। তাঁকে অনুভব করতে হলে যথেষ্ট অনুভবী এবং জ্ঞান হওয়া দরকার।

কাঁকর পাথর জোরি কে,
মসজিদ লঈ চিনায়।
তা চরি মুল্লা বাঁগ দে,
বহরা হুয়া খুদায়।।

কবীরদাস তাঁর একাধিক দোঁহায় হিন্দুধর্মের বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা এবং আড়ম্বরের তীব্র সমালোচনা করেছেন। মুসলমান ধর্মের মধ্যেও বেশ কিছু কুসংস্কার ঢুকে গেছে। যদি আমরা এই দুটি ধর্মকে কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করতে না পারি তাহলে ভবিষ্যতে এই দুটি ধর্মের খুব দুর্দিন ঘনিয়ে আসবে। অধ্যাত্ম মানবতাবাদী সাধক হিসাবে কবীর এই দুটি ধর্মের বিভিন্ন দুর্বলতাকে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেছেন, মুসলমানরা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে আজান দেয়। তাঁর প্রশ্ন তোমাদের আল্লা কী একেবারে কালা হয়ে গেছেন যে তাঁকে শোনাবার জন্য মসজিদে এত জোরে আজান দিতে হবে?

সাখী আঁখী জ্ঞান কী,
সমুঝি দেখু মন মাঁহি,
বিন সাখী সংসার কা,
মগরা ছুটত নাঁহি।।

'সাখী' শব্দের অর্থ হল মহাপুরুষদের আপ্তবাক্য। কবীরের মন্তব্য—আমরা যখন অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এগিয়ে যাই তখন এই সাখীই আমাদের পথ দেখায়। মহাপুরুষদের মুখনিঃসৃত অমৃতবাণী অনুসরণ করলে জীবনে আর পদস্খলনের সম্ভাবনা থাকে না।

বূরা বংস কবির কা,
উপজিয়ো পূত কমাল।
হরি কা সুমরিন ছাঁড়ি কে,
ভরি লৈ আয়া মাল।।

প্রাচীনকালের কবিরা তাঁদের একাধিক কবিতায় বংশ পরিচয়, পিতামাতার নাম ইত্যাদি বলতেন। অনেকে সরাসরি তা বর্ণনা করতেন। অনেকে আবার হেঁয়ালির আশ্রয় নিতেন। সন্ত কবি তাঁর এই দোঁহায় বংশের

কিছুটা পরিচয় আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। কবীরের জীবনীকাররা বলে থাকেন তিনি ছিলেন বিবাহিত এবং লুই হলেন তাঁর স্ত্রী। কামাল ও নিহাল নামে তাঁর দুটি ছেলে এবং কামালী ও নিহালী নামে দুটি মেয়ে ছিল। এই দোঁহার মাধ্যমে কবীর জানাচ্ছেন তাঁর বংশ ছিল অত্যন্ত দরিদ্র। কামাল নামে তাঁর একটি ছেলে হয়। এই ছেলে ঈশ্বর ভজনা ছেড়ে শুধুমাত্র অর্থ উপার্জনের দিকে মন দিয়েছিল।

নহী কো উঁচা
নহী কো নীচা।
জাকা প্যন্ড তাহী
কা সীঁচা।।
জেতু বাঁমনী জায়া,
তৈ থনে বাট হৈব কাহেন আয়া
তহৈ কবীর অধির নহিঁ কোঈ,
সো আধিম জা মুখ রাম ন হোঈ।।

এই কবিতায় কবীর জাতপাতের দ্বন্দ্বে দীন সমাজকে তীব্রভাষায় আক্রমণ করেছেন। কবীর বিশ্বাস করেন মানুষে মানুষে কোনো প্রভেদ নেই। এক দল আহাম্মক সমাজপতি নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এমন জাত বিভাজনের ব্যবস্থা করেছেন। উঁচু—নীচু জাতের প্রকাশ মানুষের দ্বারা সৃষ্ট। মানুষের সমাজে সে—ই অধম যে মুখে রাম নাম করে না।

দেখ্যা হ্যায় তো কস কহুঁ,
কহুঁ তৌ কা পতিয়ায়।
গুঁগে কেরী সরকার,
খায়ে ঔ বৈঠা মুসকায়।।

কবীর ছিলেন এক রহস্যবাদী দার্শনিক। রহস্যবাদী হওয়ার প্রাথমিক শর্ত হল আস্তিক হওয়া। কবীর ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন। নাস্তিকদের শূন্যকেও তিনি ব্রহ্মরূপে দেখতেন। তাঁর আস্তিক্য চিরাচরিত বিশ্বাসের ওপর নির্ভর না করে প্রত্যক্ষ অনুভূতির ওপর নির্ভরশীল ছিল।

এই দোঁহাতে কবীর ঘোষণা করেছেন, আমি ঈশ্বরকে দেখেছি কিন্তু তাঁর বর্ণনা দেব কেমন করে? আমার শব্দের ভাণ্ডার এত পরিপূর্ণ নয় যে আমি ঈশ্বরের অপার রূপের বর্ণনা করব। বোবা মানুষ মিষ্টি বা শর্করা খেলেও তার স্বাদ অন্যকে বোঝাতে পারে না। তেমনি কবীর তাঁর ঈশ্বরের দর্শন হলেও তাঁর রূপের বিবরণ দিতে অক্ষম।

মেরা মুঝমে কছু নহী,
জো কছু হ্যায় সো তেরা,
তেরা তুঝকো সৌঁপতা,
কেয়া লাগে হ্যায় মেরা।

কবীরদাস মনে করতেন মায়া হল ব্রহ্মের সঙ্গে মিলনের পথে সবথেকে বড়ো অন্তরায়। এই মায়া আছে বলেই আমরা আমাদের অভীষ্ট ঈশ্বরকে দেখতে পাই না। এই মায়ার বাঁধন ভেঙে বেরিয়ে আসার জন্য সকলকে উপদেশ দিয়েছেন তিনি। তিনি বলেছেন—আমার নিজের বলতে কিছু নেই, আমার যা কিছু আছে তার সবই হল সেই পরম শক্তিশালী ঈশ্বরের। তাঁর দেওয়া জিনিস আমার কাছে গচ্ছিত ছিল। আমি আবার তাঁকে আমার এইসব জিনিস ফেরৎ দেব। এতে আমার অসুবিধে কোথায়?

বন্ধ করি দৃষ্টি কো
ফেরি অন্দর করৈ,
ঘট কপাট গুরুদেব খোলৈ।
কহত কবীর তু দেখ সংসার মে,
গুরুদেব সমান কোঈ নাহি তোলৈ।।

কবীরদাসের মতো গুরুর বর্ণনা কোনো কবি করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। তিনি তাঁর অসংখ্য দোঁহার মাধ্যমে গুরুর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নিবেদন করেছেন। তিনি বলেছেন—দু—চোখ বন্ধ করে একবার নিজের অন্তরের দিকে তাকাও, তাহলে দেখবে মনের দরজা খুলে ঈশ্বর তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন। কবীর বলেছেন, একবার সংসারের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো, সংসারের সর্বত্র গুরুদেবের চিহ্ন বিরাজ করছে। তাই আমাদের সকলের উচিত গুরুর সঙ্গে একীভূত হওয়া। তা না হলে সংসার অনলে সদাসর্বদা আমাদের দহনদগ্ধ হতে হবে।

রাম বিন তন কী তাপ ন জ্যাঈ
জলকী অগিন উঠি অধিকাঈ।
তুমু জলনিধি ম্যায় জল কর মীনা
জল মে রহে জলহিঁ বিন ছীনা।।
তুমু পিঞ্জরা ম্যায় সুবনা তোরা,
দরসন দেহু ভাগ বড় মোরা।
তু মু মতগুর ম্যায় নৌতম চেলা,
কহৈ কবীর রাম রমূঁ অকেলা।

রহস্যবাদী মহান দার্শনিক কবীর এই দোঁহায় রামভক্তিকে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, রামের সঙ্গে তার জন্ম—জন্মান্তরের সম্পর্ক। প্রতি মুহূর্তে তিনি রামের সঙ্গে নৈকট্য বোধ করেন। কবীরের বক্তব্য—রামের সঙ্গলাভ করার সুযোগ না থাকলে তাঁর দেহের তাপ মেটে না। তাঁর কাছে রাম জলের মতো। তিনি হলেন সেই জলের মাছ, জল ছাড়া যেমন মাছের জীবন বাঁচে না, রামনাম ছাড়া কবীরের জীবনও অনর্থক। রাম যদি হন পাখির খাঁচা, তাহলে তিনি সেই খাঁচার পাখি। রাম তাঁর জন্ম জন্মান্তরের চলিষ্ণু ঈশ্বর। তিনি হলেন রামের দাসানুদাস। সদাসর্বদা তিনি নির্জনে বসে রামের আরাধনা করতে চান।

আসম কিয়ে পবন দিঢ়ে দিঢ় রহু রে,
মন কা মৈল ছাঁড়ি দে বৌরে,
কেয়া সীঁ গী মুদ্রা চমকায়ে,
কেয়া বিভুতি সব অঙ্গ লগায়ে,
সো হিন্দু সো মুসলমান,
জিসকা দূর রহৈ ঈমান।।
সো ব্রহ্ম জো কথৈ গিয়াঁন,
কাজি সো জানে রহমাঁন
কহৈ কবীর কহু আন কীজৈ,
রাম নাম জপি লাহা নীজৈ।।

কবীর ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার বিরোধী ছিলেন। তিনি সেই ধর্মের প্রচারক ছিলেন যে ধর্ম আমাদের সৎ, শোভন এবং সুন্দর জীবনের অভিসারী করে তোলে। কবীর তাঁর একাধিক দোঁহায় যথেষ্ট কঠোর ভাষায় ধার্মিক, গোঁড়ামি এবং সাম্প্রদায়িকতার নিন্দা করেছেন। এই সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি হিন্দুধর্ম এবং মুসলমান ধর্মের নানা কুসংস্কারকে প্রবলভাবে আঘাত করেছেন। কবীরের বিশ্বাস মানুষ যদি অন্তরে সৎ, শোভন এবং সুন্দর হয় তাহলে তাকে কোনো ধর্মের ভেক বা পোশাক পরতে হয় না। এই দোঁহার মাধ্যমে কবীর তাঁর এই চিরন্তন ভাবনাটিকে প্রকাশ করেছেন।

দিন কো রোজা রখত হ্যায়,
রাত হনত হ্যায় গায়,
ইয়হে তে খুন হে বন্দগী,
কৈসে খুসি খুদায়।।

মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের নানা ত্রুটি—বিচ্যুতি কবীরকে ব্যথাতুর করে তুলত। তিনি বলেছেন, মুসলমানরা সারাদিন রোজা পালন করে। রাতে পেট ভরে খায়। এমন আচরণ করলে কি আল্লাহ সত্যি খুব খুশি হন?

মূঢ় মুড়ায়ে হরি মিলৈ,
সব কোউ লেই মুড়াই।
বার-বার কে মুড়নে,
ভেড় ন বৈকুণ্ঠ জাই।।

হিন্দু ধর্মের নানা কু—সংস্কার কবীরকে দুঃখ দিত। কবীর বুঝতে পেরেছিলেন কীভাবে কিছু লোভী পণ্ডিত এবং ব্রাহ্মণদের ষড়যন্ত্রে সনাতন হিন্দুধর্ম কলুষিত হয়ে পড়ছে। তিনি মাথা নেড়া করা সন্ন্যাসীদের বিরোধিতা করেছেন। তিনি মনে করেন—এ হল এক ধরনের ধর্মীয় ভণ্ডামি। এই ভন্ডামির সমালোচনা করতে বিন্দুমাত্র চিন্তা করেননি কবীর। কবীর বলেছেন, অনেকে মনে করে থাকেন মাথা নেড়া করলেই বুঝি ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করা যায়। তাই যদি হত বার বার মাথা মুড়িয়ে ভেড়া কেন বৈকুণ্ঠে যেতে পারে না? কবীরের বিশ্বাস এইভাবে মাথা নেড়া করলে আমরা কোনো কিছুই লাভ করতে পারি না।

হমারে কৈসে লোহূ,
তুমহারে কৈসে দূধ।
তুমহ কৈসে ব্রাহ্মণ পাঁড়ে,
হম কৈসে সূদ।।

কবীরদাস জাতপাতের ঊর্ধ্বে বিচরণ করতে ভালোবাসতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, জাতিভেদ প্রথা হল মানুষের সৃষ্টি। বর্ণের কারণে এক জাতির মানুষ অন্য জাতির মানুষকে নানাভাবে অপমান করে। এমনটি হওয়া কখনোই উচিত নয়। কারণ এই পৃথিবীতে আমরা সকলে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সন্তান। ব্রাহ্মণরা শূদ্রদের দূরে সরিয়ে রাখে। কিন্তু ব্রাহ্মণের রক্ত আর শূদ্রের রক্তের মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য আছে কি? সকলেরই রক্তের রং লাল। ব্রাহ্মণের রক্ত আর দুধের রং যদি শূদ্রের রক্ত আর দুধের থেকে আলাদা না হয় তাহলে ব্রাহ্মণ আর শূদ্রে ভেদাভেদ কেন?

কবীর ছিলেন সমাজ—সচেতক এক মহাপুরুষ। তাঁর ভাবনার সঙ্গে তিনি তাঁর সাম্যবাদী সমাজভাবনাকে মিলিয়ে দিয়েছিলেন। এই দোঁহাটি পড়লে আমরা তাঁর সেই প্রগতিপন্থী মনোভাবের পরিচয় পেয়ে থাকি।

বৈসনো ভয়া তো কেয়া ভয়া,

বূমা নঁহী বিবেক।
ছাপা তিলক বনাই করি,
দগধ্যা লোক অনেক।।

বৈষ্ণবরাও কবীরের সমালোচনার শিকার হয়েছিলেন। বৈষ্ণবদের মধ্যে অনেক মিথ্যা আড়ম্বর দেখতে পাওয়া যায়, যা কোনোমতেই কাম্য নয়। বিষ্ণুর উপাসকেরা কেন নিজেদের সবার সামনে জাহির করবেন? কবীর এই দোঁহার মাধ্যমে ওই বৈষ্ণবদের আনুষ্ঠানিকতার বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেছেন, বৈষ্ণব হলেই কি মানুষ ভালো হয়? তিনি অনেক বৈষ্ণবকে দেখেছেন যাদের বিবেক বলে কিছু নেই। কপালে তিলক কেটে তারা অনেক মানুষের ক্ষতি সাধন করে। এইসব ছদ্ম—বৈষ্ণবদের থেকে দূরে থাকতে হবে বলেই কবীরের অভিমত।

তীরথ বরত সব বেলহী,
সব জগ মেল্যা ছাই।
কবীর মূল নিকন্দিয়া
কৌন হলাহল খাই।।
মন মথুরা দিল দ্বারিকা,
কাবা কাশী জাঁন।
দসবাঁ দ্বারা দেহুরা তামৈঁ
জ্যোতি পিছাঁন।।

তীর্থ, ব্রত এইসব আচার অনুষ্ঠানের তীব্র বিরোধী ছিলেন মহাত্মা কবীর। তিনি তীব্রভাবে এই বিষয়ের সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, অনেকে সকলের সামনে নিজেকে শুদ্ধ এবং সৎ দেখাবার জন্য তীর্থ ভ্রমণ করে, দানধ্যান করে। এতে কোনো লাভ হয় না। তাঁর মতে, মানুষের মনই হল দ্বারকা, কাবা, কাশী অথবা মথুরা। তাই পুণ্য অর্জনের জন্য অন্য কোথাও যাবার দরকার নেই। সকল মানুষকে ভালোবাসলে এবং ঈশ্বরকে আরাধনা করলে মানুষ তীর্থে যাবার পুণ্য অর্জন করতে পারবে।

জলে জিউ প্যারা মাছরি,
লোভী প্যারা দাম।
মাতা প্যারা বাল্কা,
ভক্ত পিয়ারা নাম।।

ভক্তের কাছে ভগবান হলেন অতি প্রিয় বস্তু। ভক্ত ভগবানকে কতটা ভালোবাসে তার একটি পরিচয় কবীর আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। মাছ যেমন জলকে ভালোবাসে এবং লোভী মানুষ যেমন অর্থ—সম্পদ, যশ ও প্রতিষ্ঠাকে ভালোবাসে, মা যেমন সন্তানকে ভালোবাসে, ঠিক সেভাবেই ভক্ত তাঁর প্রভুকে ভালোবাসেন। ভক্তের এই ভালোবাসার মধ্যে লুকিয়ে আছে মাছের জলের—প্রেম, লোভীর অর্থ—প্রেম, মায়ের সন্তান—প্রেমের মতো আন্তরিক প্রেম।

মোরি চুনরি মে পরি
গয়ো দাগা পিয়া,
পাঁচ তত্ত কৈ বনি চুনারিয়া
সোলহ সৈ বন্ধু লাগৈ জিয়া।
ইয়হ চুনরি মোরে মৈকেতে

আয়ি সসুরেমে মনুয়া খোয় দিয়া।
মলি—মলি ধোই দাগা না ছুটে
জ্ঞানকো সাবুন লাগ পিয়া।
কহত কবীর দাগা তব ছুটিই
জব সাহব আপনার লিয়া।

আমার চুনরি অর্থাৎ ওড়না। শরীরের তাপ লেগে গেছে। অর্থাৎ আমার শরীর এখন কামনা বাসনার দ্বারা দাগী হয়ে গেছে। এই শরীরে পাঁচটি তত্ত্ব লুকিয়ে আছে। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে আকাশ, জল, আগুন, হাওয়া এবং পৃথিবী—এই পাঁচটি বস্তুই আমাদের শরীর। আমাদের শরীর নানা মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ। আমরা মায়ের বাড়ি, বাবার বাড়ি, শ্বশুর বাড়ির দিক থেকেও নানা বন্ধনে নিজেদের বেঁধে ফেলি। চুনরিরূপী শরীর থেকে জ্ঞানরূপী সাবানের স্পর্শেও ওই দাগ যায় না। তাই কবীরদাস বলেছেন যখন ঈশ্বর সত্যি সত্যি আমাদের তাঁর কাছে ডেকে নেবেন তখন আমাদের শরীর শুদ্ধ হবে। তখন আমরা মায়ার সংসার থেকে মুক্তিলাভ করতে পারব।

পিয়া চাহে প্রেমরস,
রাধা চাহৈ মান।
এক ম্যানমে দো খড়গা,
দেখা সুনা ন কান।।

দোঁহার মাধ্যমে কবীর বলেছেন যে ঈশ্বরভক্তি এবং ব্যক্তিস্বার্থের পুর্তি একই সঙ্গে সম্ভব নয়। কেউ যদি মনে করে থাকেন যে তিনি সাংসারিক সমস্ত আনন্দ—বিনোদন ভোগ করবেন আবার ঈশ্বরেরও প্রার্থনা করবেন, তাহলে তাঁর ঈশ্বর—প্রার্থনা সফল হবে না। নিজের গর্ব, অহংকার থাকলে কখনোই আমরা ঈশ্বরের চরণ আশ্রয় করতে পারব না। একটি খাপের মধ্যে যেমন একসঙ্গে দুটি তরোয়াল রাখা যায় না, ঠিক তেমনভাবেই ঈশ্বরভক্তি ও স্বার্থপরতাকে একইসঙ্গে রাখা সম্ভব নয়। কবীর বলেছেন, এমন ঘটনা তিনি কখনো দেখেননি বা শোনেননি।

মালা তো করমে ফিরৈ,
জীৎ ফিরৈ মুখ মাহিঁ।
মনবাঁ তো দশ দিসি ফিরৈ,
ইহয় তো সুমিরন নাহিঁ।।

এই দোঁহার মাধ্যমে কবীর একটি শাশ্বত সত্যকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, অনেক মানুষ সবসময়ে মালা জপ করেন। এইভাবে তিনি তাঁর ঈশ্বর—সান্নিধ্য সকলের কাছে তুলে ধরেন। কিন্তু মালা—জপা সকলেই ঈশ্বরপ্রেমী নন, তাঁদের মধ্যেও অনেক ভণ্ড ও প্রতারক লুকিয়ে আছেন। তিনি বলেছেন, মালা—জপা যোগীরা হাতে মালা জপে আর মনে অন্যের অনিষ্ট করার কথা চিন্তা করে। অর্থাৎ আমি একরকম কাজ করব আর মনে অন্যরকম ভাবব এমনটি কখনো করা উচিত নয়। এইসব মানুষের মন দু—দিকে দৌড়োয়। এটি মোটেই সুলক্ষণ নয়।

মেরা তেরা মনুষাঁ কৈস
এক হোই রে।
ম্যায় কহতা হোঁ আঁখিন দেখি,
তূ কহতা কাগজ কী লেখী।।

ম্যায় কহতা সুরঝাবনহারী,
তূ রাখ্যো অরুঝাই রে।
ম্যায় কহতা তু জাগত রহিয়ো,
তু রহতা হ্যায় সোই রে।।

কবীরদাস তাঁর এই পদে বলেছেন যে আত্মজ্ঞানে জ্ঞানী ব্যক্তিরা বিষয়জালে জড়িয়ে পড়েন না। সাধারণ মানুষ কামনা বাসনার দ্বারা প্রতি মুহূর্তে প্রলোভিত হয়। কবীর তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা এই দোঁহাতে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন—আমি অনেক কিছু আমার চোখে দেখেছি। আমি দেখেছি অনেকে পুঁথিপড়া বিদ্যে আউড়ে যায়। অনেকে আবার জীবনযুদ্ধে পরাস্ত হয়। সাধারণ মানুষ কিন্তু এইসব ঝড়ঝঞ্ঝা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে। কবীরের অনুরোধ, মানুষ যেন সদাসর্বদা ঈশ্বরের অভিসারী হয়ে ওঠেন, বাসনা কামনার বিবর থেকে মুক্ত হয়ে পরম পিতার সন্ধান করেন। তাহলেই তিনি আত্মজ্ঞানে বলীয়ান হয়ে উঠতে পারবেন।

মালা ফেরত জুগ গয়া,
গয়া না মনকা ফের।
করকা মনকা ডারি কৈ,
মনকা মনকা ফের।।

কবীরদাস ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান এবং ব্রত ইত্যাদির বিরোধী ছিলেন। হিন্দু বা মুসলমান ধর্মে এই জাতীয় নানা আড়ম্বর দেখতে পাওয়া যায়। তিনি দুই ধর্মের এই কুসংস্কারগুলির বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন। অগ্নিবর্ষী শব্দবাণে সেগুলিকে বিদ্ধ করেছেন। কবীর বলেছেন, মনের মলিনতা কাটাবার জন্য মানুষ মারা যাবে। মালা জপতে জপতেই তার জীবন শেষ হয়ে যায়, তবুও তার মনের সেই মলিনতা কখনো যায় না। কবীরের বিশ্বাস এইভাবে শুধুমাত্র জপ করে মানুষ তার ঈপ্সিত পথে পৌঁছোতে পারে না। তাই কবীরের বক্তব্য হাতে মালা—জপা ছেড়ে দিয়ে মনের পরিবর্তন করা দরকার। তবেই আমরা আমাদের জীবনের কাঙ্ক্ষিত সত্যের সন্ধান পাব। তখন আর আমাদের এইসব আনুষ্ঠানিকতার দিকে মন দিতে হবে না।

নৈনোঁ কী করি কোঠরী,
পুতলী পলঁগ বিছায়,
পলকোঁ কী চিক ডারিকৈ,
পিয়েগো লিয়া রিঝায়।।

নিজের অন্তরে কীভাবে কবীর ঈশ্বরকে স্থান দেবেন, এই দোঁহাতে তিনি সেই কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, চোখ দুটিকে করবেন কুটির, চোখের তারাকে বিছানা। দু—চোখের পাতা দিয়ে তৈরি করবেন দেওয়াল। এমন এক নিরাপদ স্থানে তিনি তাঁর ঈশ্বরকে এনে বসাবেন এবং একমনে তাঁর আরাধনা করবেন।

ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা কতখানি পরিব্যাপ্ত হলে তবে এমন কথা বলা যায়, এই দোঁহাটি পড়লে আমরা তা বুঝতে পারি।

হরিসে জনি তূ হেত কর,
কর হরিজনসে হেত।
মাল মুকুল হরি দেত হ্যায়,
হরি হরিজন হরি হী দেত।।

এই দোঁহায় কবীর মানুষকে প্রেম করার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন তুমি যদি সর্বহারা মানুষের সঙ্গে সখ্যের সম্পর্ক স্থাপন করো তাহলে তোমাকে আর ঈশ্বর আরাধনা করতে হবে না। কারণ এইসব হরিজনদের মধ্যেই হরির অবস্থান। তুমি নিরন্নের মুখে অন্ন তুলে দাও। যার মাথায় ছাদ নেই সেখানে ছাদের ব্যবস্থা করো। যারা সমাজে অস্পৃশ্য তাদের পাশে পৌঁছে যাও। তাহলে দেখবে তুমি একদিন হরির পদ স্পর্শ করতে পেরেছ। হরিজনের সেবা করলেই হরিকে পাওয়া যায়।

এই দোঁহার মাধ্যমে কবীর তাঁর সমাজ—সচেতক মনের পরিচয় দিয়েছেন।

প্রীতমকো পতিয়াঁ লিখুঁ
জো কহুঁ হোয় বিদেস।।
তনমে মনমে নৈন মে,
তাকো কহা সঁদেস।।

একজন প্রেমিক তার বিদেশবাসী প্রেমিককে চিঠি লেখে। চোখের জলে লেখা সেই চিঠিতে সে তার বিরহ ব্যথার কথা বারবার ঘোষণা করে। প্রেমিক আবার কবে আসবে এ প্রশ্ন সে করে। কিন্তু কবীর বলছেন, তিনি কেন শুধু শুধু তাঁর রামকে চিঠি লিখবেন? শ্রীরাম তো তাঁর শরীরের সর্বত্র অবস্থান করছেন। তিনি চোখ খুললে স্থল—জল—অন্তরীক্ষে রামের মুখচ্ছবি দেখতে পান। রামের সঙ্গে কখনো তাঁর বিরহ রচিত হয় না। তাই কখনো তাঁকে চিঠি লিখতে হবে না।

সাধু গাঁঠি ন বাঁধঈ,
উদর সমাতা লেয়।
আগে পিছে হরি খাড়ে,
জব মাঁগে তব দেয়।।

কবীর বলেছেন, সৎ মানুষ কখনো অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করেন না। যতটুকু তাঁর প্রয়োজন তিনি ততটুকু খাদ্য গ্রহণ করেন। এই দোঁহার মাধ্যমে তিনি পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, একজন সত্যিকারের সুখী মানুষের অতিরিক্ত লোভের প্রয়োজন নেই। এই পৃথিবীতে ভগবান সকলের জন্য উপযুক্ত খাদ্য ও বস্ত্রের ব্যবস্থা রেখেছেন। লোভী মানুষ সেই বিষয়টিকে নষ্ট করে দেয়। তাই কবীরের উপদেশ—আমরা যেন অতিরিক্ত কোনো কিছুর প্রতি লোভ না করি। এইসব মানুষের ওপর সদাসর্বদা ঈশ্বরের আশিস বর্ষিত হয়।

নিরমল ভয়া তো কেয়া ভয়া,
নিরমল মাঁগে ঠোর।
মল নিরমলতেঁ রহিত হ্যায়,
তে সাধু কোই ঔর।।

কিছু মানুষ নানা ধরনের পাপ কাজে নিজেকে নিযুক্ত করে। কিছু মানুষ স্বচ্ছ ও পাপ—রহিত হয়। এঁরাই হলেন সাক্ষাৎ ভগবান। পৃথিবীতে এমন মানুষের সংখ্যা যত বাড়বে, পৃথিবীটা ততটাই এক বাসভূমি হিসাবে বিবেচিত হবে।

ইয়হ তন বিষকী বৈলরী,
গুরু অমৃত কী খান।
সীস দিয়ে জো গুরু মিলৈ,
তৌ ভি সস্তা জান।।

কবীর বলছেন মানুষের দেহ হল বিষের লতা। আর ঈশ্বর হলেন অমৃতের খনি। পৃথিবীতে যিনি একবার উপযুক্ত গুরুর সন্ধান পেয়েছেন, তাঁর মতো ভাগ্যবান আর কেউ নেই। গুরুই হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ, গুরুর ওপর আর কেউ কখনো থাকতে পারেন না। এটি হল কবীরের আন্তরিক অভিজ্ঞান।

ক্যায়া মুখ লৈ বিনতি করৌ,
লাজ আবত হ্যায় মোঁহি।
তুম দেখতে ঔভুন করো,
কৈসে ভাঁবৌ তোহি।।

হে প্রভু! আমি কোন মুখে আপনার কাছে প্রার্থনা করব? আমি কীভাবে আপনার কাছে আমার মনোগত বাসনা নিবেদন করব? আপনার চোখের সামনে একটির পর একটি অন্যায় কাজ করেছি। এই কাজগুলো আপনি সমর্থন করবেন না তা আমি জানি।

এই দোঁহার মাধ্যমে কবীর ঈশ্বরের কাছে অকপট স্বীকারোক্তি করেছেন। জীবন ও জীবিকার স্বার্থে প্রত্যেক মানুষকে কিছু না কিছু পাপ কাজ করতে হয়। কিন্তু ঈশ্বর কি তার জন্য আমাদের শাস্তি দেন? আবেগাপ্লুত কণ্ঠস্বরে কবীর এই প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করেছেন।

উততে কোই ন বাহুরা,
জাসে বুঝুঁ ধায়।
ইততেঁ সবহী জাত হ্যায়,
ভার লদায় লদায়।।

কবীর বলেছেন স্বর্গ থেকে কেউ এই পৃথিবীতে আসে না। স্বর্গ বলে কোনো অস্তিত্ব এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নেই। ইচ্ছা করলে আমরাই আমাদের সুকৃতির দ্বারা পৃথিবীর বুকে এক টুকরো স্বর্গ রচনা করতে পারি।

কহতা তো বহুত নিলা,
গহতা মিলা ন কোই।
সো কহতা বহি জান দে,
জো নহিঁ গহতা হোই।।

পৃথিবীতে অনেকেই অনেক বড়ো বড়ো কথা বলে থাকে। নানাভাবে নিজেকে জাহির করে। অহংকারের স্পর্ধিত পদচিহ্ন আঁকে। আবার কিছু মানুষ আছে যারা কেবল নীরবে, নিভৃতে কাজ করে যায়। কবীরের অভিমত হল আমাদের উচিত ওইসব প্রচার—বিমুখ মানুষদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো। তাদের কাজে সহযোগিতা করা। আর যেসব মানুষ অহংকারী তাদের সংশ্রব এড়িয়ে চলা।

বৃচ্ছ কবহুঁ নহিঁ ফল তখৈঁ,
নদী ন সঞ্চৈ নীর।
পারমার থেকে কারণে,
সাধু ন ধরা সরীর।।

পৃথিবীতে সাধু অর্থাৎ পুরুষ শ্রেণির মানুষ কেন আবির্ভূত হন? কবীর এই দোঁহার মাধ্যমে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন গাছ কখনো তার ফল নিজে খায় না। নদী কী তার জল নিজে ব্যবহার করে? গাছ তার ফল সকলকে দেয়, নদী তার জল সকলকে দেয়। আর এইভাবেই পুণ্য মানুষেরা তাঁদের জীবনব্যাপী

সাধনলব্ধ ফলাফল সকলের হাতে নির্দ্বিধায় তুলে দেন। এইভাবেই তিনি একজন পবিত্র সৎ মানুষের বিচার করেছেন।

কবীরা নৌবত আপনি,
দিন দস লহু বজায়।
ইয়হ পুর পট্টন ইয়হ গলি,
বহুরি ন দেখৌ আয়।।

কবীর বলেছেন, এ জীবন বড়োই ছোটো। তাই এই জীবনে সমস্ত অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে। এরপর তিনি বলেন—সংক্ষিপ্ত সময়সীমার জন্য পৃথিবীতে এসেছ। একদিন তোমায় এই সাধের পৃথিবী ছেড়ে অন্য কোথাও অন্য কোনো লোকে চলে যেতে হবে। পরে হয়তো আর কখনো তুমি এই বসুন্ধরাতে জন্মগ্রহণ করার সুযোগ পাবে না।

এই দোঁহার মাধ্যমে কবীর সব মানুষকে কর্মমুখর হতে বলেছেন। কর্মই জীবন এবং জীবনই কর্ম—এমন কথাই তিনি বলেছেন।

অনগড়িয়া দেবা,
কৌন করৈ তেরি সেবা।
গাঢ়ে দেব কো সব কোঈ পূজৈ,
নিত হী লাবৈ সেবা।।

কবীরদাস নিজে একটি বিশেষ ধার্মিক চেতনার অনুগামী ছিলেন। সেই চেতনায় পৌত্তলিকতাকে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। কবীর নিরাকার ব্রহ্মের সাধনা করতেন। কবীর বিশ্বাস করতেন যে তাঁর ঈশ্বর স্থল—জল—অন্তরীক্ষ সর্বত্রই বিরাজমান। আমরা যেমন বাতাসকে দেখতে পাই না, কিন্তু বাতাস যে আছে তা অনুভব করতে পারি। সেইভাবে কবীরের ঈশ্বরকেও আমরা আমাদের উপলব্ধির মধ্যে আনতে পারি। এইভাবে কবীর তাঁর দার্শনিক অভিব্যক্তির কথা এই দোঁহার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

জৈসা অন-জল খাইয়ে,
তৈসা হী মন হোয়।
জৈসা পানি পিজিয়ে,
তৈসী বানী সোয়।।

মানুষ যেমন খাদ্য গ্রহণ করে তার মনোভাব তেমনই হয়। যে মানুষ মাংসাশী হয় তার মনে হিংসা আছে। যে মানুষ নিরামিশাষী তার মন কোমল হয়। আবার যে মানুষের যেমন মুখের ভাষা, সেই ভাষা শুনলে আমরা বুঝতে পারি যে সেই মানুষ কোন অঞ্চলের বাসিন্দা। কবীর বলেছেন, প্রত্যেক অঞ্চলের একটি আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

মাঁগন মরণ সমান হ্যায়,
মত কোই মাঁগৌ ভিখ।
মাঁগন সে মরণা ভলা,
ইরহ সতগুরু কী সিঙ্খ।।

এই দোঁহায় কবীর বলেছেন ভিক্ষে করা এবং মৃত্যু একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। তিনি বলেছেন—কখনো ভিক্ষা করবে না। অল্প আহার করবে, পরিমিত পোশাক পরবে। কখনো অতিরিক্ত উচ্চাশা করবে না।

অহংকারী হবে না। এটি হল কবীরের একটি সমাজ—সচেতক দোঁহা। এই দোঁহাটি লিখে কবীর প্রমাণ করেছেন যে, তিনি শুধুমাত্র অধ্যাত্ম—সাধক ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন সমাজ—সংস্কারকও।

কহত কবীর সমনাশী
রাম মিলৈ অবিনাশী।।

কবীরের রামনাম তাঁর গুরু রামানন্দের রামের থেকে ভিন্ন। রামানন্দ যে রামের উপাসনা করেন তিনি হলেন বিষ্ণুর অবতার এবং দশরথের পুত্র। পিতৃসত্য পালনের জন্য সেই রাম চৌদ্দ বছর বনবাসী হয়েছিলেন। আর কবীরের রাম হলেন নিরাকার ও অবিনাশী। কবীরের রামের কোনো অবয়ব নেই, কবীরের রাম সর্বত্র বিরাজমান।

এই দোঁহা লিখে কবীর ব্রহ্মের সঙ্গে রামের একীকরণ করেছেন।

অরে ইন দূহন রাইন পাঈ।
হিন্দু অপনৌ করৈ
বড়াঈ গাগর ছুবন ন দৈঈ।।

কবীর মানুষকেই শ্রেষ্ঠ বলেছেন, কবীর বলেছেন মানুষের মধ্যে কোনো বিভেদ থাকা উচিত নয়। মনুষ্যেতর প্রাণী অনেক ত্যাগ ও তিতিক্ষার পর মানুষ হিসাবে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়। মানুষ হল ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানুষের চেতনা আছে, স্মৃতি আছে, বোধ আছে, বিদ্যা আছে। তাই মানুষের উচিত একে অন্যকে ভালোবাসা। তাহলেই আমরা এক সুন্দর শোভন পৃথিবীর স্বপ্নকে সফল করতে পারব।

মাটি এক ভেদ ধরি নানী
সব মে ব্রহ্ম সমানা।
কহৈ কবীর ভিস্ত ছিট কাঈ
দোজগ হী মনভানা।

এই দোঁহাতে কবীর ধর্মের বিভিন্নতাকে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন পৃথিবীর সমস্ত মানুষ এক ও অভিন্ন। আমরা সবাই একই ব্রহ্ম থেকে সৃষ্টি হয়েছি। তাহলে কেন আমরা পরস্পর হানাহানি করব? মৃত্যুর পর সব মানুষ একই ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যাবে। তাই আমাদের উচিত সমস্ত ধর্মের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করা। তবেই আমরা এক আদর্শ পৃথিবীর স্বপ্নকে সফল করতে পারব।

তেরা সাঁঈ তুঝ মে, জ্যিঁউ পুহুপনাম বাস।
কস্তুরী কা মিরগ কিঁ্যউ, ফিরি ফিরি টুটে ঘাস।।

মানুষ ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য এখানে সেখানে পাগলের মতো খুঁজে মরে। অথচ সে জানে না যে ঈশ্বর তার মধ্যেই অবস্থান করেন। এই দোঁহায় কবীর সেই কথাই বলেছেন। তিনি বলেছেন, তোমার ঈশ্বর তোমার মধ্যেই (তেরা সাঁঈ তুঝ মে) রয়েছেন। তাঁকে পাওয়ার জন্য মন্দিরে, মসজিদে বা গির্জায় যেতে হবে না। কস্তুরী মৃগ (কস্তুরী কা মিরগ) তার দেহের সুবাসস্থান খুঁজে পাবার জন্য অরণ্যে ঘাসে ঘাসে মুখ দিয়ে ফেরে অথচ সে জানে না সুগন্ধী কস্তুরী তার দেহের মধ্যেই রয়েছে। ফুলের মধ্যেই যেমন সুগন্ধ (জিঁউ পুহুপনাম বাস) থাকে, তেমনি মানুষের মধ্যেও সুগন্ধরূপী ঈশ্বর অবস্থান করেন।

কথনী মিঠি খাঁড়—সী করনী বিষকী লোয়।
কথনী তজি করনী ক'রে, তো বিষ মে অমৃত হোয়।।

কবীরদাস বলছেন, এমন কিছু মানুষ আছে যারা মুখে খুব মিষ্টি কথা (কথনী মিঠি খাঁড়—সী) বলে কিন্তু কর্মক্ষেত্রে তারা বিষের থেকেও জ্বালাময় (বিষ কী লোয়) কাজ করে। যেসব মানুষ মুখে কথা না বলে কাজ করে (কথনী তজি করণী ক'রে) তাদের কাজ বিষের মতো জ্বালাময় হলেও তা অমৃত সমান।

আঁতধা ঘড়া ন জল মে ডুবে, সুধা সুভর ভরিয়া।
জাকৌ ইয়হ জগ ঘিন করি ঢলৈ, না প্রসাদি নিস্তারিয়া।।

মায়ার প্রভাব থেকে মানুষকে মুক্ত থাকার জন্য কবীর মানুষকে কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলছেন, সংসার বিমুখ হয়ে থাকতে পারলেই মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা যায়। কলসীর মুখ উলটো করে জলে ডোবালে ডোবে না, কিন্তু ওই কলসীই আবার সোজা করে জলে ডোবালে ডুবে যায়। এইভাবে মানুষ সংসারে আসক্ত হলে মায়ার সমুদ্রে ডুবে যায়। কিন্তু সংসার—বিমুখ হয়ে থাকতে পারলে মায়ার বন্ধন থেকে সে মুক্ত থাকতে পারে।

জৌগী গোরখ গোরখ করেরে, হিন্দু রাম নাম উচ্চরৈ।
মুসলমান কহৈ এক খুদাঈ কবীর কা স্বামী ঘট—ঘট রহা সমাঈ।।

কবীর যেমন তাঁর ব্রহ্মকে সর্বব্যাপী বলে বর্ণনা করেছেন, তেমনি আবার তাঁর ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা করতেও পারছেন না। তিনি বলছেন যোগীরা 'গোরখ গোরখ' করে, হিন্দুরা 'রাম রাম' করে আর মুসলমানরা সদাই খোদার নাম ডাকে। ব্রহ্ম সর্বব্যাপী হওয়ায় তিনি তাঁদের সবার মধ্যেই অবস্থান করেন।

মোহি আগ্যা দঈ দয়াল, দয়া করি কাহুকূঁ সমঝাই।
কহত কবির ম্যায় কহি—কহি হারয়ো, অব মোহি দোস না লাই।।

কবীরদাস তাঁর রচনায় সকল ধর্মের, সম্প্রদায়ের আচার—অনুষ্ঠানের ত্রুটির নিন্দা করেছেন। তিনি সব ধর্মের গ্রহণযোগ্য বিষয়গুলি গ্রহণ করতে মানুষকে পরামর্শ দিয়েছেন। আর পরিশেষে কবীরদাস বলছেন তিনি এটা নিজের ইচ্ছায় করেননি। ঈশ্বরের প্রেরণায় তিনি মানুষকে এই পথে চলতে বলছেন।

বড়া দুয়া তো কেয়া হুয়া, জৈসে পেড় খজুর।
পন্থী কো ছায়ী নহী, ফল লাগৈ অতি দূর।।

সন্ত কবীর তাঁর এই দোঁহায় সেইসব মানুষদের উদ্দেশে সৎ পরামর্শ দিচ্ছেন, যাঁরা জীবনে বড়ো হবার বাসনা রাখেন। তিনি বলছেন, জীবনে উন্নতি করা, বড়ো হওয়া ভালো জিনিস, তাই বলে খেজুর গাছের মতো বড়ো হয়ে লাভ নেই। প্রকৃতিতে দেখা যায়, খেজুর গাছ বড়ো হয়, অনেক লম্বা হয়। অথচ মানুষের কোনো উপকারে আসে না। শুষ্ক মরুভূমির প্রান্তরে এই গাছ মানুষকে একটুও ছায়া দেয় না। এই গাছ অতি লম্বা হওয়ায়, এর ফলও থাকে অনেক দূরে, নাগালের বাইরে। তাই বড়ো হলেও এ গাছ মানুষের উপকারে লাগে না। সেজন্য তিনি বলেছেন, খেজুর গাছের মতো বড়ো হয়ে কোনো লাভ নেই।

মাটি কহৈ কুম্হার কো, তু কেয়া রূঁদে মোহিঁ।
ইকো দিন অ্যায়সা হোয়েগা, ম্যায় রূদুঁগি তোহিঁ।।

কুমোর মাটি নিয়ে কাজ করে। তাকে প্রতিদিন নানা রকমের মাটির পাত্র তৈরি করার জন্য মাটি দলতে, মাখতে হয়। সেজন্য কুমোর হয়তো মনে করে সে যেভাবে মাটিকে ব্যবহার করবে, সেভাবে তাকে ব্যবহৃত হতে হবে। কুমোরের এই ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণ করার জন্য কবীরদাস বলেছেন, কুমোরই চিরকাল দলে যাবে

না, এমন একদিন আসবে যেদিন মাটিও কুমোরকে দলবে, মাখবে (ম্যায় রদুঁগি তোহিঁ)। অর্থাৎ কিনা কাজ এক তরফা নয়, দু—তরফা।

ভাব ভগতি বিসবাস বিনু, কটৈ ন সঁসৈ মূল।
কহৈ কবীর হরি ভগতি বিনু, মুক্তি নঁহী রে মূল।।

কবীরদাস ভক্তিকেই প্রাপ্তির মূল পথ বলে মনে করতেন। তাই তিনি বলছেন, মানুষের মনে যদি ভক্তি (ভগতি) না থাকে তাহলে মনের মলিনতা কাটে না। তিনি বলছেন, হরির প্রতি ভক্তি প্রদর্শন ভিন্ন মুক্তি নেই।

ভলী-ভঈ জু ভৈ পড়য়া, গঈ দশা সব ভুল।
পালা গলি পাঁনী ভয়া, ঢুলি মিলিয়া উস কূল।।

এই দোঁহায় কবীরের ঈশ্বর ভক্তির আত্ম—নিবেদিত রূপ প্রকাশ পেয়েছে। সমুদ্রের বুকে এক বিন্দু জল পড়লে যেমন সেই জল সমুদ্রে মিশে যায়, ঈশ্বরে আত্মনিবেদিত মানুষের অবস্থাও অনেকটা সেই রকম হয়।

না ইহু মানস না ইহু দেঊ, না ইহু জাতি কহাবৈ সেউ।
না ইহু জোগী না অবধূতা, না ইহু মাঈ ন কাহু পূতা।।

অর্থাৎ তিনি বলছেন এই দেহের মালিক সেই পরমাত্মা ঈশ্বর। আত্মা ও পরমাত্মা দুয়েরই মালিক তিনি।

ভজি নারদাদি সুকাদি বন্দিত চরণ পধা ভামিনী।
ভজি ভজিসিঁ ভূষণ পিয়া মনোহর দো দেব সিরোবনী।।
বুধি নাভি চন্দন চরচিকা তন রিদা মন্দির ভীতরা।
রাম রাজসি নৈন বাণী সুজান সুন্দর সুন্দরা।।
বহু পাপ পরবত ছৈদনা ভৌ জাপি দুরপি নিবারণা
কহৈ কবীর গোবিন্দ ভজি পরমানন্দ বন্দিত কারণা।।

কবীর ভক্ত মানুষ। তাই তিনি তাঁর উপাস্যের মধ্যে সংসারের যাবতীয় গুণ অবলোকন করেন। তাঁর ভগবান সংবেদনশীল, করুণাময় ও তিন লোকের অধীশ্বর। তাই কবীর তাঁর বন্দনা করেন। এই বন্দনা সাকার ব্রহ্মের উপাসনাকারী ভক্তদের উপাসনার মধ্যে পড়ে। কবি তুলসীদাসও এই একই শব্দাবলির ব্যবহারযোগ্য থাকার ব্রহ্মের বন্দনা করেছেন।

জব মৈঁ থা তব হরি নহিঁ, অব হরি হ্যায় হাম নহিঁ।
প্রেম গলি অতি সাঁকরী, তামেঁ দোন সমাহিঁ।।

কবীরদাস বলছেন, ঈশ্বরভক্তি এবং বিষয়—বাসনা একই সঙ্গে চলতে পারে না। তিনি বলেছেন, 'জব মৈ থা' অর্থাৎ মানুষ যখন নিজের বিষয়চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত, তখন ঈশ্বর তার থেকে অনেক দূরে (তব হরি নহীঁ) অবস্থান করেন। আবার যখন মানুষের মনে ঈশ্বরের প্রাধান্য (অব হরি হ্যায় হাম নহিঁ) তখন বিষয় বাসনার স্থান অতি দূরে। তিনি বলেছেন, প্রেমের পথ অতি সংকীর্ণ (সাঁকরী) এবং সংকীর্ণ প্রেমের পথে একই সঙ্গে দুজনের অবস্থান সম্ভব নয়।

ইয়ে দুনিয়া দুঈ রোজ কী, মত কর যা সে হেত।
গুরু চরণো সে লাগিয়ে, জো পূরণ সুখ দেত।।

কবীরদাস বলছেন, মায়া বড়ো বিষম বস্তু। এই পৃথিবীতে মানুষের আগমন সামান্য কয়েক দিনের (দুঈ রোজ কী) জন্য। তাই এই পৃথিবীর প্রেম বা মায়ার বাঁধনে (যা সে হেত) নিজেকে বেঁধে ফেলো না। তার চেয়ে গুরুর ভজনা করো। গুরুর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে (চরণো সে লাগিয়ে) পড়ে থাকো। গুরুই মানুষকে পরিপূর্ণ সুখ (পূরণ সুখ) দিতে পারেন।

জো তোকোঁ কাঁটা বুধৈ, তাহি বোবতু ফুল।
তোহি ফুল হ্যায়, ওয়া তো হ্যায় তিরসুল।।

এই দোঁহায় কবীরদাস বলছেন, সৎ মানুষের উচিত সদাচরণ করা। যে তোমার গায়ে কাঁটা ফোটাবে (কাঁটা বুধৈ), অর্থাৎ তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে, তার সঙ্গে তোমাকেও যে খারাপ ব্যবহার করতে হবে তা কিন্তু নয়। তোমার গায়ে কাঁটা ফোটালেও তুমি তার দিকে ফুল এগিয়ে দাও। তোমার ফুলের বিনিময়ে তুমি ফুলই পাবে আর তার কাঁটার বিনিময়ে সে পাবে তিরসুল অর্থাৎ ত্রিশূল।

মোকো কহাঁ ঢুঁঢ়ে বন্দে,
ম্যায় তো তেরে পাসমে।
না ম্যায় বকরি না ম্যায় ভেড়ী
না ম্যায় ছুরী গঁড়াসমে।
নহি খালমে নহি পোঁছমে।
না হাডডি না মাসমেঁ।
না ম্যায় দেবল না ম্যায় মসজিদে
না কাবে কৈলাশমে।
না তৌ কৌ নোঁ ক্রিয়া কার্যমে
নহি জোগ বৈরাগমে।।
খোঁজী হোয় তুরতে মিলিহোঁ
পল ভরকী তলাসমে।
ম্যায় তো বহিঁ সহরকে বাহর
মেরী পুরী মবাসমে।।
কহে কবীর শুনো ভাই সাধো,
সব সাসোঁকি সাঁসমে।।

কবীরদাস তাঁর এই পদে মানুষের কাছে ঈশ্বরের বিকাশ বাতলে দিয়েছেন। মানুষ ভাবে ঈশ্বর বুঝি এমন কোনো গোপন স্থানে অবস্থান করেন, যেখানে মানুষের যাওয়া সম্ভব নয়। মানুষ থেকে তিনি অনেক দূরে অবস্থান করেন। মানুষের এমন ধারণা ভুল বলেই তিনি পদের শুরুতে বলেছেন। ওহে আমার ভক্ত শিষ্য (বন্দে) আমাকে তুমি খোঁজো কেন, আমি তো তোমার কাছেই আছি। আমি ছাগলও (বকরি) নই, আবার ভেড়াও নই, খাপে পোরা ছুরিও নই। মানুষের দেহের চামড়া (খালমে), হাড়, মাংসে আমাকে পাবে না। মন্দির, মসজিদ বা কৈলাসেও আমার দেখা পাবে না। আমাকে পাওয়ার জন্য অত দৌড়—ঝাঁপের প্রয়োজন নেই। আমাকে পাবে সাংসারিক মায়ার বন্ধনের বাইরে। মানুষের হৃদয় নামের নগরীতে অবস্থান। শারীরিক কামনা সংযম করলেই আমাকে পাওয়া যায়।

ইয়হ সব সুধী বন্দগী, বিরথা পঞ্চ নমাজ।
সাঁচে মারে ঝুঁঠি পয়ি, কাজি করৈ অকাজ।।

অসৎ পুরোহিত, গোঁসাই থেকে যেমন তিনি সমাজের সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে দিয়েছেন, তেমনি কাজি ও মোল্লাদের থেকেও মানুষকে সতর্ক করতে ভোলেননি। তিনি বলছেন, ওই পাঁচবার নামাজ পড়া, কুর্নিশ করা বৃথা। মিথ্যে মিথ্যে সাধারণ মানুষকে দিয়ে এসব করিয়ে কাজি ও মোল্লারা সুখ ভোগ করে। সুতরাং তাদের কথার ফাঁদে পোড়ো না।

বে দিন কব আবেঁগে মাই।
জা কারণ হম দেহধরী হ্যায়, মিলিবৌ অঙ্গ লগাই।।
হৌ জাঁনু বে হিল মিল খেলুঁ, তনমন প্রাণ সমাই।
য়া কামনা করৌ পরি—পূরণ, সমরথ হৌ রাম রাই।।
মাঁহি উদাসী মাধব চাহেঁ, চিতবত রৈ ন বিহাই।
সেজ হমারি—সংঘ বই হ্যায়, জব সেঁ উ তব ঘাই।।
বহু অরদাস দাস কী সুনিয়ে, তন কী তপন বুঝাই।
কহে কবীর মিলৈ জৈ মাঈ, মিলি করি মঙ্গল গাই।।

কবীরদাস তাঁর এই পদে প্রিয়ের সঙ্গে মিলনের বাসনা প্রকাশ করেছেন। তাঁর প্রিয় শ্রীরাম। তিনি প্রিয়ের সঙ্গে মিলিত হতে আগ্রহী। তাঁর ব্যাকুলতা এই কবিতার ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে। বিরহ বেদনায় আতুর, অত্যন্ত ব্যাকুল এই কবি জানতে চাইছেন, সেদিন কবে আসবে, যেদিন তিনি তাঁর প্রেমিকের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ পাবেন!

কবীর মায়া পাপিনী, ফন্দ লৈ বৈধী হাটি।
সব জগতা ফঁদে পড়য়া, গয়া কবীরা কাটি।।

এই অংশেও কবীরদাস সেই মায়ার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, মায়া অতি পাপিনী। এই মায়া মানুষকে ধরবে বলে ফাঁদ পেতে বসে আছে। সব মানুষ এই মায়ার ফাঁদে পড়ে মারা যায়। সর্বস্বান্ত হয়। তবে কবীরকে মায়ার ফাঁদে জড়িয়ে তার ক্ষতি করা সম্ভব নয়। কারণ তিনি তো মায়ার ফাঁদ কেটে বেরিয়ে তাঁর প্রিয় রামের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন।

অবধূ নিরঞ্জন জাল পসারী।
স্বর্গ পতলাল জীব মৃত মণ্ডল, তীন লোক বিস্তারা।
ব্রহ্ম, বিষ্ণু, সিব প্রকট কিয়ো হ্যায়, তায় দিয়ো সিরও ভারা।।
ঠাঁও ঠাঁও তীরথ বৃত থাগ্যো, গৈনে কো সংসারী
মায়া মোহ কঠিন বিস্তারা, আপু ভয়ো করতারা।।
সতগুরু সবদ কো চীহ্নত নাহীঁ, কৈসৌঁ হোয় উবারা।
জারি—ভূঁজি কোহলা করি ডাকে, ফিরি ফিরি—লৈ অবতারা।।
অমর লোক জহাঁ পুরুষ বিরাজৈ, তিনকা মূঁদা দ্বারা।
জিন সাহেব মে ভয়ে নিরাঞ্জন সে তৌ পুরুষ হ্যায় নিয়া।।
কঠিন কাল তো বাঁচা চাহো, গঁহো সবদ টকসারা।
কহে কবীর অমর কর রাখৌ, মানি সবদ হমারা।।

এই পদে কবীরদাস নিরঞ্জনকে স্পষ্টরূপে মায়া বলে বর্ণনা করেননি। তবে এটিকে মায়ার সমান বলে উল্লেখ করেছেন। মায়ার মতো নিরঞ্জনও গোটা পৃথিবীকে ভ্রমের মধ্যে রেখে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার চেষ্টা করে। তাই তাঁর মত হল, এটিকে মায়া বলে মনে করা উচিত।

রাম ভজৈ সো জানিয়ে, জাকৈ আতুর নাহিঁ।

মত সন্তোষ লিয়ে রহৈ, ধীজ মন মাঁহি।।
জন কো কাম ক্রোধ ব্যাধো নহী, ত্রিষ্ণা ন জারৈ।
প্রফুল্লিত আনন্দ মে, গোব্যন্দ গুণ গাবৈ।।

কবীরদাস বলছেন, মায়ার বাঁধন থেকে মুক্তির সব থেকে বড়ো উপায় হল ঈশ্বরভক্তি। ভক্তির সাহায্যেই ঋষি, মুনি, দিগম্বর, যোগীরা মায়ার প্রভাব মুক্ত থেকে ঈশ্বরসাধনা করে যেতে পেরেছিলেন। এই ঈশ্বরভক্তির জন্যই কাম ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি মায়ার সহচরদের বিনাশ ঘটে। মায়ামুক্ত হয়ে ভক্ত নিশ্চিন্তে ঈশ্বর বন্দনা করতে পারে।

মায়া ছায়া একসি, বিরলা জানৈ কোয়
ভগতকে পাছে ফিরৈ অনমুখ ভাগৈ সোয়।।

প্রকৃতি থেকে উদাহরণ টেনে এনে কবীরদাস মানুষকে বোঝাতে চাইছেন মায়া বড়ো বিষম বস্তু। একমাত্র ছায়ার মাধ্যমেই মায়ার বিষমতা প্রকাশ করা যায়। যে মানুষ মায়া অর্থাৎ সংসার থেকে দূরে সরে যেতে চায়, ছায়ার মতো মায়া তার পিছু পিছু ফেরে। আর যে মানুষ আগ বাড়িয়ে মায়ার বাঁধনে পড়তে চায়, ছায়ার মতো তার কাছ থেকে দূরে সরে যায়। তার পক্ষে আর মায়ার বাঁধনে বাঁধাপড়া হয়ে ওঠে না।

সন্তো ঠোখা কাঁসো কহিয়ে
গুণ যো নির্গুণ, নির্গুণ যো গুণ
বাট ছাঁড়ি কিউঁ কহিয়ে।।

ভক্তি যুগের কবিদের মধ্যে দুটি ধারা বিদ্যমান ছিল—একটি সগুণ সম্প্রদায়, অপরটি নির্গুণ সম্প্রদায়। এই দুই মতাবলম্বীদের মধ্যে মতান্তরজনিত বিরোধও দেখা দিত মাঝে মাঝে। কবীরদাস মনে করতেন, আসলে এই সগুণ নির্গুণ বিরোধ কিছুই নয়। দুটিই মূলত এক। সেই চিন্তাধারা থেকে তিনি এই কথা লেখেন।

কেয়া জপ কেয়া তপ কেয়া সংযম কেয়া বরত কেয়া অত্থান।
জব লগি জুক্তি ন জানিয়ে, ভাব ভক্তি ভগবান।।

তিনি যেমন ঈশ্বর—ভক্তির কথা বলছেন, তেমনই আবার নানা আচার অনুষ্ঠান বিষয়ে মানুষকে সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি বলছেন, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিমার্গে মিলিত হবার জন্য জপতপ, সংযম, ব্রত পালনের প্রয়োজন নেই। মানুষকে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছোবার জন্য কারোর সাহায্য, কোনো আচার অনুষ্ঠানের সাহায্য নিতে তিনি রাজি নন।

পায়া পকড়তা প্রেম কা, সারী কিয়া সরীর।
সতগুরু দাও রুইয়া, খেলৈ দাস কবীর।।

কবীরের গুরু কবীরকে প্রেম—ভক্ত হবার আদেশ দিয়েছিলেন। সেই আদেশের সমর্থনে তিনি যে যুক্তি দেখিয়েছিলেন কবীর তা—ই এই দোঁহার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

জো তুম দেখো সো ইয়হু নাঁহী, ইয়হ পদ অগম অগোচর মাঁহী।
কহৈ কবীর জো অম্বর জানৈ, তাহী সুঁ মেরা মন মানৈঁ।।

কবীরদাস সৃষ্টিকে অত্যন্ত রহস্যময় বলে মনে করতেন। এবং এই সৃষ্টির মূলে কোনো অদৃশ্য শক্তির ক্ষমতার আভাস তিনি দেখতে পেতেন। তিনি বলছেন, এই যে দৃশ্যমান বাস্তবে নামরূপী সংসার, এটি কোনো অদৃশ্য শক্তির দ্বারা পরিচালিত।

জাতি পাঁতি পুঁছে নহিঁ কোঈ।
হরি কা ভজৈ সো হরি কা হোঈ।।

কবীরদাস মানুষের জাতপাতে বিশ্বাস করতেন না। ভক্তিযুগে তিনি যে সম্প্রদায়ের কবি ছিলেন, সেই সম্প্রদায়ের মানুষ জাতপাতের বিচারে বিশ্বাস করতেন না। মানুষের মধ্যে কোনো রকমের বিভেদ মেনে নিতে পারতেন না। তাঁদের চোখে, যে ঈশ্বরের ভজনা করে, সে—ই ঈশ্বরের ভক্ত। তাই তিনি বলেছেন, জাতপাত (জাত পাঁতি) জানতে চেয়ো না (পুছে নহিঁ কোঈ)। যে হরি অর্থাৎ ঈশ্বরের ভজনা করে, সে—ই ঈশ্বরের আপনজন হয়ে যায় (হরি কা হোঈ)।

সুখিয়া সব সংসার হ্যায়, খায়ৈ অরূ সোবৈ।
দুখিয়া দাস কবীর হ্যায়, জাগৈ অরূ রোদৈ।।

এই সংসারে অর্থাৎ পৃথিবীতে তারাই সুখী (সুখিয়া), যারা সারা দিন খায় দায় আর ঘুমিয়ে বেড়ায়। আর দুঃখী কবীরদাসের মতো কিছু মানুষ, যারা সুখী মানুষের হাল দেখে জেগে জেগে কেবল কাঁদে (জাগৈ অর রোবৈ)। এই পৃথিবীতে কবীরদাসের মতো মানুষের সুখ নেই।

সভি রসায়ন হম করি, নহিঁ নাম সম কোয়।
রঞ্জক ঘটমে সঞ্চয়ে, সব তন কঞ্চন হোয়।।

কবীরদাস তাঁর এই দোঁহায় ঈশ্বরের মাহাত্ম্যই প্রচার করেছেন। তিনি বলেছেন, সব (সভী) ধরনের ওষুধপত্র (রসায়ন) ইত্যাদি আমি খেয়েছি (করি)। খেয়েও এমন কোনো ফল পাইনি, যে ফল পেয়েছি ঈশ্বরের (সম) নাম করে। তিনি আরও বলেছেন, এই ঈশ্বরের নামরূপী পদার্থ (রসায়ন) অতি সামান্য (রঞ্জক) পরিমাণেই শরীরে (ঘটমে) প্রবেশ করলে সে শরীর সোনার (কাঞ্চন) মতো মহা মূল্যবান হয়ে ওঠে (হোয়)। তাঁর বিচারে ঈশ্বরের নামের ওপর আর কিছু থাকতে পারে না।

পোথী পয়ি পয়ি জগ মুবা, পণ্ডিত ভয়া ন কোই।
একৈ আখর প্রেম কা, পয়ে মো পণ্ডিত হোই।।

এই দোঁহায় কবীরদাস প্রেমের জয়গান গেয়েছেন। তিনি বলেছেন সারা দুনিয়ার পুঁথি পাঠ (পোথী পয়ি পয়ি জগ মুবা) করলেই পণ্ডিত হওয়া যায় না। পণ্ডিত বা জ্ঞানী হতে গেলে একটা শব্দের সঙ্গে পরিচিত হলেই হয় (একৈ আখর) এবং সেই শব্দটি হল প্রেম। প্রেম অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রেম, মানবপ্রেম। তাঁর চিন্তায় প্রেমের স্থান সবার ওপরে।

দুর্বলকো ন সতাইয়ে, জাকী মোটি হ্যায়
বিনা জীব কী স্বাস সে, লোহ ভসম হৈব জায়।।

তিনি বলেছেন, দুর্বল মানুষকে কষ্ট দেওয়া (সতাইয়ে) উচিত নয়। কারণ, দুর্বল মানুষের অভিশাপ অত্যন্ত শক্তিশালী (মোটি)। দুর্বল মানুষের অভিশাপ যে কতটা শক্তিশালী সেটা বোঝাতে গিয়ে তিনি বলছেন, কামারের হাপরের হাওয়া (বিনা জীব কী স্বাস সে) যেমন লোহা গলিয়ে দেয়, তেমনি দুর্বল অসহায় মানুষের ক্রোধও সব কিছু ভস্ম করে দেয়। তাই তিনি বলেছেন, দুর্বল মানুষের ওপর নিরর্থক অত্যাচার কোরো না।

দান দিয়ে ধন না ঘটে, নদী ন ঘটে নীর।
আপনি আঁখো দেখিয়ে, য়োঁ কথি কহৈ কবীর।।

এই দোঁহায় কবীরদাস মানুষকে উদার হতে বলেছেন। তিনি বলছেন, দান করলে ধন কমে যায় না (দান দিয়ে ধন না ঘটে)। প্রকৃতি থেকে নিজের এই কথার সমর্থনে উদাহরণ টেনে বলেছেন, যেমন নদীর জল নদী কারুকেই দিতে কার্পণ্য করে না। কার্পণ্য করে না বলেই নদীর জলেও ঘাটতি পড়ে না (নদী না ঘটে নীর)। শুধু প্রকৃতিতে কেন, নিজের চোখের দিকেও তাকিয়ে দেখুন (আপনি আঁখো দেখিয়ে), সেখানেও জলের কোনো অভাব নেই। তাই তাঁর উপদেশ, দান করো, দান করলে কোনো ক্ষতি হয় না।

সাধু অ্যায়সা চাহিয়ে, জৈসা সুপ সুভায়।
সার সার কো গহি রহৈ, যোথা দেহ উড়ায়।।

সৎ সাধু কেমন হওয়া উচিত, এই দোঁহায় কবীর সেই কথাই বলেছেন। সাধু মানুষ কেবল সার জিনিসই গ্রহণ করবেন। অসার অপ্রয়োজনীয়গুলো ত্যাগ করবেন।

পানি কেরা বুদবুদা, অস মানুষ কী জাতি।
দেখত হি ছিপি জায়েগা, জিঁউ তারা পরভাতি।।

কবীরদাস বলছেন, মানুষ জাতির জীবন জলের বুদবুদের মতো! বড়ো ক্ষণস্থায়ী এই জীবন। প্রভাতে (পরভাতি) আকাশের তারা যেমন একবার দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায় (দেখত হি ছিপি জায়েগা), তেমন মানুষের ক্ষণস্থায়ী জীবনও উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায়।

নেহ নিভায়ে হি বনে, সোচে বনে ন আন।
তন দে, মন দে, সীস দে, নেহ ন দীজৈ জান।।

এই দোঁহায় সন্ত কবীর প্রেমের মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন। তিনি বলেছেন, নেহ অর্থাৎ প্রেম দিলেই প্রেম পাওয়া যায়। প্রেম পাবার জন্য ভাবনার শিকার হলে চলবে না। দেহ, মন, মাথা সবই বিসর্জন দেওয়া যায়। কিন্তু প্রেমকে কখনো বিসর্জন দেওয়া যায় না।

মেরা মুঝে মে কুছ নহি, জো কুছ হ্যায় সো তোর।
তেরা তুঝকো সৌঁপতে, কেয়া লাগৈগা মোর।।

তাঁর কথা হল, আমার নিজের বলতে কিছু নেই। (মেরা মুঝে মে কুছ নহি)। আমার যা কিছু 'সো তোর' অর্থাৎ আপনারই। এখানে আপনি বলতে তিনি প্রভু ঈশ্বরকে বলছেন। আমার সবকিছু আপনার হওয়ায় আপনার কাছে আমার সবকিছু বিসর্জন দিতে আমার কখনো বাধবে না।

গুরু গোবিন্দ দোউ খড়ে, কাকে লাগৌঁ পাঁয়।
বলিহারী গুরু আপনে, জিন গোবিন্দ দিয়ো বতায়।।

কবীরদাসের মতে গুরু এবং গোবিন্দের (ভগবানের) মধ্যে গুরু শ্রেষ্ঠ। সাধারণ মানুষ দ্বন্দ্বে পড়ে যায়, গুরু এবং ভগবানের মধ্যে কাকে যে আগে প্রণাম করবে (কাকে লাগৌঁ পাঁয়)। মানুষের মনে এমন দ্বন্দ্ব হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁর কথা হল, মানুষের উচিত এই দ্বন্দ্ব ভুলে গুরুকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে তাঁর পদতলে মাথা নত করা। কারণ, গুরুই ঈশ্বরের সঙ্গে (গোবিন্দ দিয়ো বতায়) আমাদের মেলবন্ধন ঘটিয়ে দেন। সেজন্য তিনিই শ্রেষ্ঠ।

কবীর গুরুকী ভক্তি করুঁ তজি বিষয়া রস চৌজ।
বার বার নহিঁ পাহি হৈ, মানুষ জনম কী মৌজ।।

কবীর বলছেন, গুরুভক্তির মধ্যে যত আনন্দ, অত আনন্দ বিষয়—বাসনা পূর্তির মধ্যেও নেই। তিনি বলছেন, বিষয়—বাসনা ত্যাগ করে (বিষয়া রস চৌজ) আমি যদি নিরন্তর গুরুর ভজনা করে যাই, তাহলে আমি সুখ লাভ করব। এই আনন্দ সুখ থেকে আমি বঞ্চিত হতে চাই না। মনুষ্য জন্মের আনন্দ তো বার বার মেলে না।

তিনকা কবহুঁ ন নিদিয়ে, জো পাঁয়ন তর হোয়।
কবহুঁ উড়ি আঁখিন পরৈ, পির ঘনেরি হোয়।।

কোন ক্ষুদ্র জিনিসকেই অবহেলা করা উচিত নয়। তিনকা অর্থাৎ খড়কুটো বলে পায়ের নীচে (পাঁয়ন তর) চাপা দিয়ে অবহেলা ভরে চলে যাওয়া উচিত নয়। যে—কোনো সময় উড়ে চোখের ওপর পড়ে খুবই কষ্টের (পির ঘনেরি) কারণ ঘটাতে পারে। এখানে খড়কুটো উদাহরণ মাত্র। আসলে তিনি মানুষকেই বোঝাতে চেয়েছেন। বলতে চেয়েছেন যে, কোনো মানুষকেই তুচ্ছ জ্ঞান করা উচিত নয়।

দুখ মে সুমিরণ সব করেঁ, সুখ মেঁ করৈ ন কোয়।
জো সুখ মে সুমিরণ করৈ, তো দুখ কাহে হোয়।।

দুঃখের সময়ে সবাই ঈশ্বরের কথা স্মরণ করে। বার বার ঈশ্বরকে ডাকে। তাঁকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু সুখের সময়ে তাদের মধ্যে এ ব্যাকুলতা দেখা যায় না। সুখের সময়ে তারা ঈশ্বরের কথা ভাবে না। ঈশ্বরকে আমলই দেয় না। তা এমন মানুষ ঈশ্বরকে স্মরণ করে কী পেতে পারে? কবীর বলছেন তারাই ঈশ্বরকে পায়, যারা সুখের সময়ে, আনন্দের সময়েও ঈশ্বরকে স্মরণ করে। তাঁকে কাছে পাবার জন্য আকুল হয়।

ইহ মন সকতী ইহ মন সবি।
ইহ মন পাঁচ তত্ত্বোঁ কা জীব।।
ইহ মন জে উনমন রহৈ।
তো তীন লোক কী মাতা কহৈ।।

নাথপন্থীদের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গিও কবীরদাসকে প্রভাবিত করেছিল। এই প্রভাবের প্রমাণ বহন করে উপরোক্ত কাব্য অংশটি। একালে বিশেষজ্ঞের মতে এই পদটির রচয়িতা কবীরদাস আবার একশ্রেণির বিশেষজ্ঞের মতে এই পদটির রচয়িতা গোরখনাথ। নাথপন্থীরা শিবের উপাসক ছিলেন। তাঁরা শিবকেই প্রধান বলে জানতেন। শরীর, মন, শক্তি সবকিছুই শিবের দান বলে মনে করতেন।

পূজা করূঁ ন নমাজ গুজারূঁ।
এক নিরাকার হিরদয় নমসকারাঁ।।

কবীরের ব্রহ্ম প্রধানত নিরাকার। তবু মাঝে মাঝে তাঁর ব্রহ্ম আকার রূপে তাঁর সামনে উপস্থিত হয়েছেন। তবে প্রধানত অব্যক্ত রূপে তাঁর ব্রহ্ম সামনে উপস্থিত হওয়ায় কবীর তাঁকে মনে মনে নমস্কার করেন। তিনি স্থির করে উঠতে পারেন না যে, তাঁর দেবতা হিন্দু দেবদেবীর মতো, না কী মুসলমানদের খোদার মতো! তার চেয়ে তিনি এক নিরাকারকে মনে মনে বন্দনা করতে চান, নমস্কার করতে চান। মনে করেন সেটা করলেই তাঁর উচিত কাজ করা হবে।

পৃথ্বী কা গুণ পানি সীখা, পানি জেদ মিলাব হিঁগে।
সেজ পবন মিলি পবন সবদ মিলি, সহজ সমাধি লগাবহিঁগৈ।।

কবীরদাস ব্রহ্মকে এই সৃষ্টির সূত্র বলে মনে করতেন। সাংখ্যরা বলতেন সৃষ্টির মূল কারণ সত্য ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি। এই প্রকৃতির বিকাশের সঙ্গেই সৃষ্টির বিকাশের স্বার্থ জড়িয়ে। কবীরের ভাবনায় যে এই চিন্তা প্রভাব ফেলেছিল, তার প্রমাণ বহন করে এই অংশ।

মায়া দুঈ ভাঁতি, দেখী ঠোক বজায়।
এক গহাবৈ রাম পৈ, এক নরক লৈ জায়।।

কবীরদাস মায়াকে দুই রূপে দেখেছেন। তাঁর মতে, মায়ার একটি রূপ আত্মাকে ব্রহ্মের সঙ্গে মিলিত করে, আর—একটি রূপ মানুষকে ব্রহ্মের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়।

আগম বেলি অকাম ফল, অন ব্যাবর কা দূর।
সসা সীঁঈ কী ধনু হড়ী, রমৈ ঝাঁজ কা পূত।।

এই অংশে কবীরদাস বলতে চেয়েছেন যে মায়ার রূপ বিচিত্র। এই মায়া সৎ এবং অসৎ। তার এই দুই রূপ মানুষকে ধর্ম এবং অধর্ম এই দুইয়ের মধ্যে লীন করে রাখে। মায়ার রূপ কাল্পনিক হওয়ার কারণে অনির্বচনীয়!

মায়া তজুঁ তজী নহিঁ জাই।
ফির ফির মায়া মোয় লিপটাই।
মায়া আদর মায়া মান, মায়া নহী তঁহা ব্রহ্ম গিয়ান।
মায়া রস মায়া কর জান, মায়া কারনি তজৈ পরান।।
মায়া জপ—তপ মায়া জোগ, মায়া বাঁধী সহ বীলোগ।
মায়া জল—থল, মায়া অকাস, মায়া ব্যাপী রহী চহুঁ পাস।।
মায়া মাতা মায়া পিতা অন্তরী সুতা।
মায়া মারি করৈ বৌহার, কহৈ কবীরা মেরে রাম আধার।।

এই পদের মাধ্যমে কবীরদাস বোঝাতে চাইছেন যে, মায়া খুবই খারাপ। মায়ার বাঁধনে বাঁধা পড়লে মুক্তি নেই। তিনি বলছেন, মায়াকে ত্যাগ করলেও মায়া তোমাকে ত্যাগ করবে না। মায়া ঠিক ফিরে ফিরে এসে তোমাকে জড়িয়ে ধরবে। এই মায়ার রূপ বহু এবং এর বিস্তার সর্বত্র। বাবা, মা, স্ত্রী, পুত্র এরা সবাই মায়ার এক—একটা রূপ। তাই তিনি বলছেন, এসব ত্যাগ করে রাম নাম ভজনা করো।

মায়া মহা ঠগিনি হম জানী
তিরগুণ ফাঁস লিয়ে কর জৌলে বোলে মধুরী বাণী।।

কবীরদাস বলছেন, মায়া দূরাচারী নারীর মতো। সমাজে মোহিনী নারী যেমন পুরুষকে মোহপাশে আবদ্ধ করে তাকে পথভ্রষ্ট করে, তেমনি ভাবে পথভ্রষ্ট করে মায়া। সুতরাং মায়ার বাঁধনে যাতে না পড়তে হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

করী সূতা কেয়া করৈ, গুণ গোবিন্দ কে গাই।
তেরে সিরপর জম খড়ী, খরচ কদৈকা খায়।।

এই দোঁহায় কবীর সাংসারিক মোহ মায়ায় আবদ্ধ মানুষদের সতর্ক করে দিচ্ছেন। তিনি বলছেন, সূতা কেটে কী হবে, তার চেয়ে গুরুর গান গাও। গুরুর গান গাইলে জীবনে অনেক আনন্দ পাবে।

গোধন, গজধন, বাজিধন, ঔর রুনধন, খাল।
জব আবৈ সন্তোষ ধন, সব ধন ধূরি সমান।।

তিনি বলেছেন, মনের শান্তির মতো শ্রেষ্ঠ সম্পদ আর কিছু নেই (জব আবৈ সন্তোষ ধন)। মানুষ মানবিক সম্পত্তির অধিকারী হয়। সেইসব সম্পত্তির মধ্যে ধনরত্ন (রতন ধন), গোরু, হাতি, ঘোড়া, (গোধন, গজধন, বাজিধন) ইত্যাদি সবই পড়ে। কিন্তু মানুষ একবার মানসিক প্রসন্নতার অধিকারী হলে অন্য যাবতীয় সম্পদ ধুলোর মতো (ধূরি সমান) মাটিতে মিশে যায়। সেসব সম্পদের আর কোনো মূল্য থাকে না।

সাঁঈ ইতনা দীজিয়ে, জা মে কুটুম্ব সমায়।
ম্যায় ভি ভূখা না রহুঁ, সাধু ন ভুখা জায়।।

প্রভুর কাছে কবীরদাসের আবেদন, হে প্রভু আমার এবং আত্মীয় পরিজনের (জা মে কুটুম্ব সমায়) ভরণ পোষণের উপযুক্ত আহার বিহারের ব্যবস্থা করে দাও। আমি নিজে অভুক্ত থাকতে চাই না (ম্যায় ভী ভুখা ন রহুঁ সাধু ন ভূখা জায়), চাই না, কোনো সজ্জন ব্যক্তিও অনাহারে থাকুন।

কবীর গর্ব ন কিজিয়ে, কাল গহে কর কেস।
না জানৈ কিত মারিহৈ, কেয়া ঘর কেয়া পরদেস।।

কবীরদাস বলছেন, গর্ব কোরো না। গর্ব করা খুব খারাপ। একবার মৃত্যুর কবলে (কাল গহে) পড়লে দুঃখের আর শেষ থাকবে না। কীভাবে যে মৃত্যু তোমাকে শেষ করে (মারি হৈ) দেবে, তা তুমি জানো না। তখন কোথাও গিয়েও কোনোভাবে নিস্তার পাবে না। গর্ব মানুষকে শেষ করে দেয়। তা মৃত্যুর থেকেও ভয়ংকর।

অ্যায়সা কোঈ না মিলা, হমকো দে উপদেশ।
ভবসাগর মে বুড়তা কর গহি কাড়ৈ কেস।।

এই দোঁহায় কবীরদাস বলছেন, হে প্রভু আজ পর্যন্ত আমাকে উপদেশ দেবার মতো কারোকে পেলাম না। চিন্তার সাগরে (ভব সাগর) ডুব দিয়ে শুধু আমার ক্লেশ (কেস) বাড়ল।

প্রেম ছিপায়া না ছিপৈ, জা ঘট পরঘট হোয়।
জো পৈ মুখ বোলৈ নহীঁ, নৈন দেত হ্যায় রোয়।।

প্রেম এমনই জিনিস যে, লুকোতে চাইলেও লুকিয়ে রাখা যায় না (ছিপায়া না ছিপৈ)। এই প্রেম হৃদয়ের মাধ্যমে (ঘট পরঘট হোয়) প্রকাশ হয়ে পড়ে। যদিও (জো পৈ) মানুষ লোকলজ্জার ভয়ে মুখে প্রেম প্রকাশ করে না তবু তার দুটো চোখ অশ্রুজলের মাধ্যমে (নৈন দেত হ্যায় রোয়) তা প্রকাশ করে দেয়। এখানে এই প্রেম বলতে তিনি ঈশ্বর প্রেমের কথা বলেছেন।

সব ধরতি কাগজ করুঁ, লেখনি সব বনরায়।
সাত সমুদ্র কী মসি করুঁ, গুরু গুণ লিখা ন জায়।।

গুরু কেন শ্রেষ্ঠ, গুরু কেন মানুষের একমাত্র আরাধ্য, কবি কবীরদাস তাঁর এই দোঁহায় সে কথাই বলেছেন। তিনি বলেছেন, গুরুর গুণের কথা লিখে শেষ করা যায় না। যারা দুনিয়াটাকে (সব ধরতি) যদি কাগজ করা হয়, এবং বন—জঙ্গলকে যদি কলম করা হয় ও সেই সঙ্গে সাত সমুদ্রের জলকে যদি কালি (সাত সমুদ্র কী মসি করুঁ) রূপ ব্যবহার করে লিখতে বসা হয়, তাহলেও গুরুর গুণের কথা সম্পূর্ণ হবে না।

কাল করৈ সো আজ কর, আজ করৈ সো অবব।
পল মেঁ পরল হোয়গি, বহুরি করৈগা কব।।

অলস হয়ো না—এই দোঁহায় কবীরদাস মানুষের উদ্দেশে এই উপদেশ প্রদান করেন। তিনি বলেন, যে কাজটা কাল করব বলে ঠিক কর, সে কাজটা আজই করো। আর যে কাজটা আজ করব বলে ঠিক করেছ, সেটা এখনই (অব্ব) করে ফেল। যে—কোনো মুহূর্তে প্রলয় (পরল) ঘটে যেতে পারে। তাই যদি হয়, তাহলে কাজ করবে কখন। সুতরাং আজ করবো, কাল করবো বলে কাজ ফেলে রেখো না।

কবীর গর্ব ন কিজিয়ে, কল গহে কর কেস।
না জানে কিত মারিহৈ, কেয়া ঘর কেয়া পরদেশ।।

কবীরদাস বলছেন, এ জীবনে গর্ব কোরো না। গর্ব বড়ো বিষম বস্তু। (কল গহে) অর্থাৎ একবার মৃত্যুর খপ্পরে পড়লে আর বাঁচার রাস্তা নেই। তখন কোথায় দেশ কোথায় বিদেশ, সব সমান। তাই কোনো কিছুর জন্য গর্ব না করে সোজা পথে জীবন যাপন করে যাও।

জাতি না পুছো সাধকী, পুছ লিজিয়ে জ্ঞান।
মোল করো তরবার কা, পড়া রহন দো ম্যান।।

যিনি সাধক মানুষ, তাঁর জাত জানার চেষ্টা কোরো না। জাত—পাতের দ্বন্দ্বে দীর্ণ ভারতীয় সমাজের উদ্দেশে তাঁর আবেদন, সঠিক মানুষদের জাত জানতে চেয়ো না। মানুষের পরিচয় জাতে নয়। তাঁর পরিচয় জ্ঞানে, কর্মে। তা সে মানুষ সাধকই হোন, আর সাধারণ গৃহস্থ। তিনি তাই বিশেষ করে সাধকদের উদাহরণ দিয়ে বলছেন, তাঁদের জানতে না চেয়ে, তাঁদের জ্ঞান জানার চেষ্টা করো। যেমন তরোয়ালের খাপের থেকে তরোয়াল মূল্যবান, তেমনি মানুষের জাতের থেকে মানুষের জ্ঞান বেশি মূল্যবান। অস্ত্রের ধারটাই আসল, খাপটা নয়।

পণ্ডিত জন মাতে পঢ়ি পুরাণ, জ্যোগী মাতে জোগ ধ্যান।
সন্ন্যাসী মাতে অহমমেব, তপসী মাতে তপ কে ফের।।

সমকালীন পরিস্থিতি দেখে কবীর বুঝতে পেরেছিলেন মানুষ মাত্রেই এই ধর্মচারীদের চক্করে পড়ে ধর্মের স্বাভাবিক রূপকে ভুলে গেছে। তাই লোক— কল্যাণের জন্য লোক, সমাজ ও ধর্মের মধ্যে পরিব্যাপ্ত মিথ্যা আড়ম্বরের অন্যতম প্রচারক হলেন পণ্ডিত ও মোল্লা। তাই তিনি কারোকে মানতেন না।

পকরি জীউ আন্যা দেহ বিনাসী, মাটী কো বিসমিল কিয়া।
জ্যোতি সরূপ অনাহত লাগৌ, কহ হলালু কিউঁ কিয়া।।

কবীর কোথাও কোথাও আত্মাকে অমর বলে বর্ণনা করেছেন, আবার কোথাও ব্রহ্মের সমান আনন্দ স্বরূপ। ব্রহ্ম আনন্দ স্বরূপ। তাই আত্মাও আনন্দ স্বরূপ। সেই সঙ্গে আত্মা ব্রহ্মের ন্যায় অনাদি ও সনাতন। তাই এমন আত্মাকে খুন করা যায় না। সেজন্য মুসলমানদের জীব হত্যার বিরোধিতা করে তিনি এই পদ লেখেন।

খণ্ডিত মূল বিনাস, কহৌ কিম বিগতহ কীজৈ।
জ্যিউ জল যে প্রতিবিম্ব, তিউঁ সকল রামহিঁ জানীজৈদ।।

কবীর বেদান্ত মতকে অনুসরণ করেছিলেন। তার আর—এক প্রমাণ হল প্রতিবিম্ববাদ অদ্বৈতবাদেরই সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সৃষ্টি ব্রহ্মেরই প্রতিবিম্ব এবং বিম্ব সত্য নয়।

ভাব ভগতি বিস্বাস বিন, কটৈ ন সমৈ মূল।

কবীরদাস মনে করতেন ভক্তি ছাড়া মায়াজনিত সংশয়ের দুঃখ দূর হয় না। এবং ভক্তি ছাড়া কোনো প্রকার মুক্তি নেই। তাঁর এই দোঁহায় সেই ভাবনাই প্রকাশ পেয়েছে।

জিস মরনৈঁ থৈঁ জ্যা ডরৈ, সো মেরে আনন্দ।
কব মরি হুঁ কব দেখি হুঁ, পূরণ পরমানন্দ।।

প্রিয় প্রেম বিরহে মানুষের মরণের অবস্থা হলেও সে তো মরতে পারে না। কারণ এই অবস্থায় মৃত্যু তো অবধারিত নয়। বিরহ বেদনায় আকুল হয়েও কেবল মৃত্যু কামনা করে। এই দোঁহায় কবীরের নিজের সেরকম মনোদশাই প্রকাশ লাভ করেছে।

বামরি সুখ নাঁ রৈনি সুখ, না সুখ, না সুখ মুগিনে মাঁহি।
কবীর বিছুটয়া রাম সুঁ, নাঁ সুখ ধূপ ন ছাঁহি।।

এই দোঁহায় রামের প্রতি কবীরের প্রেম বিরহ প্রকাশ পেয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশির শব্দ শুনে রাধা যেমন উতলা হয়ে উঠতেন, তেমনি রামবিহীন কবীরের জীবন অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠেছে। তিনি বলছেন, রামের অভাবে তাঁর মোটেই শান্তি নেই।

ভগতি নারদী মগন সরীরাঁ,
ইনি বিধি ভব তিরি কহৈ কবীরা।

কবীরদাস তাঁর রচনায় অনেক স্থানে নারদীয়া ভক্তির উল্লেখ করেছেন। এটি তার অন্যতম। নারদীয়া ভক্তিতে ভাব সাধনের দ্বারাই ভাব সাধন করা হয়েছে। প্রেম এবং আসক্তি দুটোই এক, নিরাকার।

কবীর নৌবতি আপনি, দিন দাস লেহু বাজাই।
এ পুর পাটন এ গলি, বহুরি ন দেখে আই।।

লৌকিক আচরণ হিতকারী মনে করে কবীরদাস এই দোঁহায় লৌকিক আচরণের উপকারিতার কথা বলছেন। তিনি বলছেন, রাম নামের উপাসনা ভিন্ন লৌকিক জীবনে শান্তি নেই।

মাঁহি উদাসী মাখৌ চাহৌ, চিতবন রৈনি বিহাই
সেজ হমারী স্যংঘ ভঙ্গ হ্যায়, জব সোঁউ তব খাই।।

সাধকের যখন উদ্বেগের অবস্থা হয়, তখন তার কিছুই ভালো লাগে না। এই দোঁহায় সেই কথাই বলা হয়েছে। তিনি বলেন, উদ্বেগের অবস্থায় আনন্দের বিষয়ও তাঁর কাছে উদ্বেগের বস্তু হয়ে ওঠে।

মিঠি মিঠি মায়া, তজী নহিঁ জাঈ।
অগ্যানী পুরুষ কো, ভোলি খাঈ।

তিনি বলছেন, এই মায়ার রূপ বড়ো মধুর। এই মধুর রূপের মোহে পড়লে ছেড়ে আসা সম্ভব নয়। অজ্ঞ (অগ্যানী) মানুষকে ছলে বলে ভুলিয়ে মায়া শেষ করে ছাড়ে। তাই কবীরদাস বলছেন, মায়ার সংস্পর্শে যাওয়া উচিত নয়।

নট বহুরূপ খেলৈ সব জানৈ, কলা করৈ গুণ ঠাকুর মানে।
আ খেলৈ সবহী ঘট মাঁহী, দুসরা কে লেখে কছু নাঁহী।
ডাকে গুণ সোঈ পৈ জানৈ, ঔর কো জানৈ পারঅয়ানে।।

তিনি বলছেন, মায়াকে ঘিরে যা কিছু সবই মিথ্যা। অভিনেতার অভিনয়ের রহস্যের কিছুই যেমন জানা যায় না, তেমনই মায়ার সব কিছুই রহস্যময়, অনির্বচনীয়, মায়ার রহস্য কেবল ব্রহ্মই জানেন। আর কেউ নয়।

জ্যো দরপন দেখ্যা চাহিয়ে, তো দরপন মাজত রহিয়ে।
জব দরপন লাগৈ কোঈ, তব দরসন কিয়া ন জাঈ।।

তিনি বলছেন মায়া অজ্ঞানতার আর—এক রূপ। আয়নার ওপর ধুলো ময়লা পড়লে যেমন আয়নায় মুখ দেখা যায় না, তেমনি আত্মার ওপর মায়ারূপী পর্দা পড়লে পরমাত্মা দর্শন অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। তাই তিনি ওই কথা বললেন।

গোরখ-রাম একী নহিঁ উহবাঁ, ন বঁহা বেদ বিচারা।
হরিহর ব্রহ্মা ন শিব-শক্তি, না বহ তিরথ-আচারা।।
মায় বাগ গুরু জাকে নাঁহী, সো থোঁ দূজা কী অকেলা।
কহহিঁ কবীর জ্যো অবকী বুঝৈ, সোঈ গুরূ হম চেলা।।

নাথপন্থীদের আবার অবধূতও বলা হত। অবধূতদের অন্তিম লক্ষ্য হল যুক্তি। তাঁরা দ্বৈত—অদ্বৈতবাদের দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত। কবীরদাসকেও এই ভাবনা প্রভাবিত করেছিল। তিনিও এই ভাবনা থেকে মুক্ত ছিলেন। তাঁর কবিতায় সেটাই প্রকাশ পেয়েছে।

কবীর তাঁর এই পদ্যে নিরঞ্জনকে মহা ঠগ বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর চোখে নিরঞ্জনেরা খুবই ভ্রষ্ট। কবীরের এমন ধারণা হবার পেছনে কারণ এটাই যে, তাঁর আমলে এসে নিরঞ্জনী শব্দের ব্যবহার করা হয়েছিল। অনেকের মতে নিরঞ্জন—মত নাথপন্থীদেরই একটি উপ—সম্প্রদায়ের। নিরঞ্জনকে পাবার জন্য শূন্যের ধ্যান প্রয়োজন। যেটা হঠযোগেরই নামান্তর। তিনি সাধকের নিরঞ্জনদের মিথ্যাচার থেকে বাঁচাবার জন্য সতর্ক করে দিয়ে উপরোক্ত পদ লেখেন।

সেখ সবেরী বাহিরা, কেয়া হজ কাবৈ জাঈ।
জাকা দিল সাবু নহীঁ, তাকৌ কহাঁ খুদায়।।

কবীরদাস এই কাব্যখণ্ডে মুসলমানদের বাহ্য আড়ম্বরের নিন্দা করেছেন। তিনি মুসলমান ধর্মের ক্রুটির দিকগুলোর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলছেন, মুসলমান মানুষগণ যেন এগুলি সম্পর্কে অবহিত থাকেন। তিনি বলেন, মানুষ একই সঙ্গে হজ করে, কাবা গমন করে, সে—ই আবার কী করে গো—হত্যা করে তা তাঁর বোধগম্য হয় না।

অবধূ গগন মণ্ডল কর কীজৈ।
অমৃত ঝরৈ সদা সুখ উপজে, বংক নালি রস পীজৈ।।
মূল বাঁধি সর-গগন-সমানা, সুষমন যোঁতন লাগী।
কাম-ক্রোধ দোর ভয়া পলীতা, তহাঁ জোগঁনী জী।।
মনবা জাই করীবে বৈঠা, মগন ভয়া রমি লাগা।
কহৈ কবীর জিয় সংসা নাহীঁ, সবদ অনাহদ বাগা।।

সন্ত কবীরের উপর হঠযোগ সাধনার প্রভাব পড়েছিল। এই পদ প্রমাণ বহন করে। তিনি বলছেন হঠযোগের মাধ্যমে সাধক আত্মাকে শূন্যে এবং শূন্যকে আত্মার মধ্যে মিলিয়ে দেয়। এই সময় তার অন্তর, বাহির দুটিই শূন্য হয়ে ওঠে। আসলে কিন্তু তার এই শূন্যতা অন্তরে পূর্ণতারই নামান্তর এবং বাইরেও সে পূর্ণ হয়ে ওঠে।

কহৌ ভইয়া অম্বর কাহূঁ লাগা। কোঈ জানেগা জানন হার সভাগা।
অম্বর দীসৈ কেতা তারা, কৌন চতুর অ্যায়সা চিতহন হারা।

স্বাভাবিক মনুষ্য—প্রবৃত্তি অনুযায়ী কবীরের মনেও সৃষ্টিকে দেখে তার রহস্য জানার ইচ্ছা হয়েছিল। সেই বাসনাই এই অংশে প্রকাশিত হয়েছে। এখানে তিনি সেই কৌতূহলই প্রকাশ করেছেন।

কৈসে বহু কঞ্চন কে ভূষণ, য়ে কহি গালি তব গিগেঁ।
অ্যায়সে হমলোক বেদ কে বিছুরে, সুন্নহি মাঁহি সমাহিঁগে।।

কবীরদাস বেদান্তের চিন্তাভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। বেদান্তের একটি অতি জনপ্রিয় সিদ্ধান্ত বিবর্তনবাদ দ্বারাও তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই বিবর্তনবাদে বলা হয় যে মূল রূপে কোনো প্রকার পরিবর্তন ছাড়াই বাহ্য স্বরূপ পরিবর্তন ঘটানো হয়। উপরোক্ত লাইন দুটি তারই প্রমাণ বহন করে।

মায়া কী মল জহ জাল্যা, জনক কামিনী লাগি।
কহুঁ কৌ বিধি রাখিয়ে, রূঈ লপেটী তাগি।।

কবীরদাস মায়ার বন্ধন মুক্ত হবার জন্য মায়ার বিষমতা সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করে দিচ্ছেন। তিনি বলছেন, আগুন যেমন একবার তুলোকে জড়িয়ে ধরলে আর ছাড়তে চায় না, তেমনই মায়াও যাকে একবার জড়িয়ে ধরে তাকে সহজে ছাড়ে না। তাই তিনি মায়ার প্রভাব থেকে দূরে থাকতে বলছেন।

বাজীগর ডঙ্ক বজাঈ, সব খলক তাসে আঈ।
বাজীগর স্বাগুঁ তকেলা, অপনে রঙ্গঁ রমৈ অকেলা।।

এই অংশে তিনি বলতে চাইছেন, বাজিগর ডঙ্কা বাজিয়ে তার খেলা দেখায়। এই খেলা দেখার জন্য সারা পৃথিবীর মানুষ একজোট হয়। তারপর একসময় আবার জাদুকর মানুষের চোখের সামনে থেকে খেলা সরিয়ে নেয়। আবার নিজের রঙে নিজেকে রাঙিয়ে নেয়।

কবীর মায়া পাপিনী হরি মূঁ করৈ হরাম।
মুখ কড়িয়ালী কুমতি কী, কহন ন দেঈ রাম।।

কবীরদাস বলছেন মায়া পাপিনী। সে মানুষের জিভকে ব্রহ্মের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ দিতে রাজি নয়। কারণ, ব্রহ্মের সঙ্গে জিভের মিলন ঘটে গেলে কেউ মায়ার নাম করবে না। তাই সে সব সময় জিভ ও ব্রহ্মের মিলনে বাধা সৃষ্টি করে।

দুই দুই লোচন দেখা, হম হরি বিনু অউ রূপ দেখা।
নৈন রহে রঁগুলাই, সাব বেগম কহনু ন জাঈ।।

কবীরদাস বলছেন, এই যে রহস্যময় পৃথিবী, আমি এই পৃথিবীকে আমার দু—চোখ দিয়ে দেখার চেষ্টা করেছি। কিন্তু হরি ছাড়া আর কিছুই আমি দেখতে পাইনি। আমার দুটি চোখ তাঁর প্রেমে মত্ত। এ ছাড়া কিছু আমার দ্বারা বলা সম্ভব নয়।

মায়া তজুঁ তজী নহিঁ জাই।
ফির ফির মায়া মোয় লিপটাই।।
মায়া আদর মায়া মান, মায়া নহী তঁহা ব্রহ্ম গিয়ান।
মায়া রস মায়া করজান, মায়া কারনি তজৈ পরান।।
মায়া জপ—তপ মায়া জ্যোগ, মায়া বাঁধী সহ বী লোগ।

মায়া জল—থল, মায়া অকাস, মায়া ব্যাপী রহী চহুঁ পাম।।
মায়া মাতা মায়া পিতা অন্তরী সুতা।
মায়া মারি করৈ বৌহায়, কহৈ কবীরা মেরে রাম আধার।।

এই পদের মাধ্যমে কবীরদাস বোঝাতে চাইছেন যে, মায়া খুবই খারাপ। মায়ার বাঁধনে বাঁধা পড়লে মুক্তি নেই। তিনি বলছেন, মায়াকে ত্যাগ করলেও মায়া তোমাকে ত্যাগ করবে না। মায়া ঠিক ফিরে ফিরে এসে তোমাকে জড়িয়ে ধরবে। এই মায়ার রূপ বহু এবং এর বিস্তার সর্বত্র। বাবা, মা, স্ত্রী, পুত্র এরা সবাই মায়ার এক—একটা রূপ। তাই তিনি বলছেন, এসব ত্যাগ করে রাম নাম ভজনা করো।

আঁষড়িয়া ঝাঁই পড়ী, পনথ নিহারি নিহারি।
জীভড়িয়াঁ ছাল্যা পড়য়া রাম পুকারি-পুকারি।।

কবীরদাস তাঁর এই দোঁহায় অত্যন্ত বিরহ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলছেন, প্রভু শ্রীরামের বিরহে তিনি ব্যাকুল। প্রভুর পথ চেয়ে তাঁর চোখে ছানি পড়ে গেল। এবং রামের নাম উচ্চারণ করে করে তাঁর জিভ ছড়ে গেল। তবু তিনি রাম নাম ছাড়তে আগ্রহী নন। কারণ, তিনি যে রামের প্রেমে ব্যাকুল।

ইয়হু অ্যায়সা সংসার হ্যায়, জৈসা সেঁবল ফুল।
দিনদসকে বৌহার কৌ, ঝুবৈ রংগন ভুল।।

কবীরদাস এই দোঁহায় আবার সেই সংসারের অসারতার কথাই বলেছেন। তিনি বলছেন, এই সংসার শিমূল (সেঁবল) ফুলের মতো। শিমূলফুলের যেমন রূপ আছে, সংসারেও তেমনি রূপ আছে, আকর্ষণ, চটক আছে, কিন্তু মধুহীন শিমূলফুলের মতো সংসারের মধ্যে কোনো রস নেই। সুতরাং সংসারের মোহের মধ্যে পোড়ো না।

চলতে কত টেয়ে টেয়ে।
অস্থি চর্ম বিষ্ঠা কে মূদেঁ দূর গন্ধাই কে বেয়ে।।
রাম ন জপহুঁ কৌন ভ্রম ভুলে তুমতে কাল ন দূরে।
অনেক জতন কর ইহ তন রাখহু রহৈ অবস্থা দূরে।।
আপন কিয়া কছু ন হোবৈ কেয়া কো করৈ পরানী।
জানি ভলাবৈ মতি গুরু ভেঁটো একৌ নাম বখানী।।
বলুবা কে ঘরুআ মে বসতে ফুলবত দেহ অয়ানে।
কহু কবীর জিহ রাম ন চেত্যো বুড়ে বহুত সয়ানে।।

কবীরদাস মনে করতেন ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। ভক্তি ভিন্ন হরি দর্শন সম্ভব নয়। যারা রাম নাম জপ করে না, তারা সোজা পথে জীবন অতিবাহিত করতে পারে না। তাদের ভালো হয় না। বহু জ্ঞানী মানুষ রামের বন্দনা না করায় বিপদে পড়ে নিজের জীবন নষ্ট করে ফেলে। তাই তিনি বলেন ভাবভক্তিই শ্রেষ্ঠ।

বিরহ ভুবংগম তন বসৈ, মন্দ্রন লাগৈ কোয়।
রাম বিয়োগী না জিয়ৈ, তো বৌরা হোয়।।

কবীরদাস বলছেন, বিরহ যখন ভয়ংকর রূপ ধারণ করে তখন এমনই হয়। বিরহ বিষধর সাপের কামড়ের মতো। বিষধর সাপ একবার ছোবল মারলে যেমন সে বিষ কোনো মন্ত্রবলে নামানো যায় না, তেমনি যে একবার রাম বিরহে পাগল হয়ে ওঠে, কোনোভাবেই তার পাগলামি দমন করা যায় না।

নৈনা অন্তরি—আব তুঁ, জিঁউ হী নৈন ঋপেউ।
না হোঁ দেখৌ ঔর কূঁ, ন তুঝ দেখন দেউঁ।।

ভগবানের প্রতি আন্তরিক প্রেম থেকে কবীরদাস এই কথা বলছেন। তিনি বলছেন, তাঁর মন চায় ঈশ্বরকে তাঁর দু—চোখের মধ্যে বন্ধ করে নিরন্তর তাঁকেই দেখেন, যাতে কবীরকে আর কারোকে দেখতে না হয় এবং অন্য কেউও ঈশ্বরকে দেখতে না পায়।

সো জ্যোগী জাকে মন মে মুদ্রা।
রাত দিবস ন করহ নিদ্রা।।
মন মে আসন মন মে রহনা, মন কা জপ তপ মনমু কহনা।
মন মে ঋরা, মন মে সীংগী, অনহদ মাদ বজাবেঁ রঁগী।
পঞ্চ পরজারি ভসন কর ঝুকা, কহৈ কবীর সো লহসৈ লূকা।।

কবীর বর্ণিত যোগীদের অবধূতের স্বরূপের বর্ণনা নাথপন্থীদের যোগীদের স্বরূপের সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যায়। যোগীরা কুণ্ডল, কিঙ্গরী, মেঘলা, সীঙ্গী, পৈতে, ঠঁধারী, রুদ্রাক্ষ, আন্ধারী, খপ্পর ও ঝোলা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কবীর যোগীদের এই সমস্ত উপকরণের বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু তিনি মনে করেন প্রকৃত যোগী এই সমস্ত বাহ্য আড়ম্বর গ্রহণ না করে, এগুলোকে মনের মধ্যে স্থান দেয়।

ভারি কহুঁ তো বহু ডরাউঁ, হল্কা কহুঁ তো ঝুঠ।
ম্যাঁয় কেয়া জানো রাম, কৌন নয়নোঁ কবহুঁ নাদীবৈ।।

এই দোঁহায় কবীরদাস শ্রীরামের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। তিনি বলছেন, শ্রীরামকে ভারি বলতে তাঁর খুবই ভয় করে (বহু ডরাউঁ)। আবার তাঁকে হাল্কা বললেও মিথ্যে বলা হয়। আসলে শ্রীরাম যে কেমন, তা তিনি কী করে বলবেন (ম্যাঁয় কেয়া জানো) কারণ, তিনি তো কোনোদিন শ্রীরামকে নিজের চোখে দেখেননি।

কবীরের দোঁহাবলি
হিন্দি আধ্যাত্মিক সাহিত্যের উজ্জ্বল নিদর্শন

মহাত্মা কবীর সেই অর্থে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ করেননি, কিন্তু তাঁর লেখা দোঁহাবলির মধ্যে যে দার্শনিক অভিজ্ঞান লুকিয়ে আছে তা প্রতি মুহূর্তে আমাদের অবাক করে দেয়। কবীর সুফী ধর্মবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। এই ধর্মবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সর্বধর্ম সমন্বয়ের মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করা। মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের অনেক বিশিষ্ট সাধক সুফী মতবাদকে অনুসরণ করে জীবনব্যাপী সাধনা করে গেছেন। তাঁরা চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের বুকে হিন্দু এবং মুসলমান সংস্কৃতির মিলন। বাস্তববাদী মানুষ হিসাবে তাঁরা অনুভব করতে পেরেছিলেন যে ভারতের মতো একটি উপমহাদেশে সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণী প্রচার করতে হবে। এখানে যদি কোনো একটি বিশেষ ধর্মের জয়গান গাওয়া হয়, তাহলে ভারতীয়ত্ব বোধ বলতে আর কিছু থাকবে না। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ ভারত সংস্কৃতির প্রতি সশ্রদ্ধ দৃষ্টি মেলে দেন। কারণ এই সংস্কৃতি সম্পূর্ণভাবে ধর্মনিরপেক্ষ। তাই বোধহয় ভারতবর্ষের হাজার হাজার বছর ধরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পেরেছেন। প্রতীচ্য দেশের ইতিহাসবিদরা ভারতবর্ষকে বিশ্বের এক মিনি সংস্করণ বলে থাকেন। শুধুমাত্র প্রাকৃতিক বৈচিত্রের কারণেই যে এমন বলা হয় তা নয়, পৃথিবীর সব দেশের মানুষকে ভারতমাতা সাদরে গ্রহণ করেছেন। ভাগ্য অন্বেষণে নানাধর্ম, নানাভাষা, নানা সংস্কৃতির মানুষ পা রেখেছেন। ধীরে ধীরে তাঁরা ভারত সভ্যতার এক অঙ্গ হয়ে গেছেন। এদেশে আসার সময়ে তাঁরা সযত্নে বহন করে এনেছেন নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির উজ্জ্বল দিকচিহ্নগুলিকে। দীর্ঘদিন ভারতে বসবাস করতে করতে তাঁরা ভারতীয় সংস্কৃতিকে অঙ্গীকরণের মাধ্যমে গ্রহণ করেছেন। এর পাশাপাশি নিজস্ব সংস্কৃতির দিকচিহ্নগুলি ভারত সংস্কৃতির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন। আর এইভাবেই ভারতীয় সংস্কৃতি দশদিগন্তে পরিব্যাপ্ত হতে পেরেছে।

মধ্যযুগীয় ভারত—সভ্যতার উজ্জ্বল দীপশিখা সমেত এইসব মহাপুরুষেরা বিরাজ করছেন। তাঁদের কেউ মহাত্মা কবীরের মতো তাৎক্ষণিক দোঁহা লিখে নিজেদের আধ্যাত্মিক মতবাদ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ আবার সংগীত রচনা করে সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণী সকলের কাছে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করেছেন। অনেকে ছবি এঁকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়েছেন। তাঁদের সকলের সমবেত প্রসারে মধ্যযুগে ভারত—সংস্কৃতি সম্পূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠে। এই ভাবে ভারত সংস্কৃতির যে প্লাবন পরিলক্ষিত হয় তা আমাদের একেবারে অবাক করে দেয়!

এই কটি কথা মনে রেখে আমরা হিন্দি সাহিত্যে কবীরের দোঁহাবলির যে অবস্থান এবং গুরুত্ব সে বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

এই বিষয়ে বলতে হলে প্রথমেই ঐতিহাসিকদের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। আমরা জানি যে—কোনো দেশের সংস্কৃতিতে সেই দেশের সমকালীন রাজনৈতিক চিন্তন বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। তাই যখন আমরা কবীরের দোঁহাবলি বিষয়ে আলোচনা করব তখন সেই সময়কার ভারত—সংস্কৃতি কেমন ছিল সেই বিষয়ে দু—চার কথা বলা প্রয়োজন। আগে আমরা মধ্যযুগে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থান কেমন ছিল সেই বিষয়ে দু—চার কথা বলে নিই।

তখন ভারতবর্ষ নানা খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল। এক রাজ্যের সঙ্গে অন্য রাজ্যের সৎভাব বজায় ছিল না। প্রত্যেক রাজাই আত্ম—অহমিকা বোধে ভুগতেন, তাই দেখা দিত ব্যক্তিত্বের সংঘাত। রাজনৈতিক অস্থিরতার ছাপ পড়ত রাজনৈতিক অভিযাত্রায়। সব মিলিয়ে মধ্যযুগের ভারত অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল। তারই মধ্যে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো দু—একজন মহান ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে। তাঁরা বিচ্ছিন্নভাবে ভারত সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারে ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁদের চেষ্টায় মধ্যযুগীয় ভারত—ইতিহাসে মনে রাখার মতো কয়েকটি ঘটনা ঘটে যায়। এই তালিকাতে আমরা অবশ্যই মহাত্মা কবীরের নাম রাখব। তিনি একক প্রচেষ্টায় অসংখ্য দোঁহা লিখে মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করার চেষ্টা করেছিলেন। মহাত্মা কবীর হয়ে উঠেছিলেন এক আন্দোলনের প্রবক্তা। তিনি রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিতে চাননি, আধিপত্য বিস্তারে তাঁর মন ছিল না, তিনি চেয়েছিলেন মানুষের মনকে শুদ্ধ করতে। মানুষ যে অমৃতের পুত্র সেই কথা বোঝাতে। মহাত্মা কবীরের এই মহৎ প্রয়াস যে অনেকাংশে সফল এবং ফলপ্রসূ হয়েছিল তা বলা যায়। আজও উত্তর ভারতের গ্রামে—গঞ্জে অসংখ্য মানুষ পরম শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে তাঁর দোঁহা পাঠ করেন। হয়তো তাঁরা সকলে ওই দোঁহার অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন করতে পারেন না, কিন্তু এই দোঁহার মধ্যে আলোকিত জীবনের কথা বলা হয়েছে এই বিষয়টি তাঁরা বুঝতে পারেন। তাঁদের জীবনে নানা ঝড়ঝঞ্ঝা আসে, চলার পথে দেখা দেয় নানা বিপদ, তাঁরা সেই বিপদের মোকাবিলা করেন। হয়ে ওঠেন আর—একটু বেশি আত্মবিশ্বাসী। এই দোঁহাগুলি পরোক্ষভাবে তাঁদের চরিত্র গঠন করে। আমাদের স্থির বিশ্বাস বৈদ্যুতিন যন্ত্রের প্রবল জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও কবীরের দোঁহার গ্রহণযোগ্যতা আগামী দিনে এতটুকু কমবে না। হয়তো এই প্রজন্মের তরুণ—তরুণীরা তাঁকে সেভাবে আবিষ্কার করতে ইচ্ছুক নন, কিন্তু একদিন আবার কবীরের দোঁহার পুনর্মূল্যায়ন হবে। নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষিত করা হবে তাঁর অসংখ্য দোঁহাকে। নতুন যুগের গবেষক দেখাবেন কীভাবে কবীর অধ্যাত্ম চেতনা এবং সামাজিক মননকে সংমিশ্রিত করেছিলেন। আর এভাবেই কবীরের প্রচেষ্টায় হিন্দি অধ্যাত্ম সাহিত্যের এক নতুন দিগন্তের দুয়ার উন্মোচিত হবে।

কবীরের দোঁহার মধ্যে যে আধ্যাত্মিকতা লুকিয়ে আছে তার বিচার বিশ্লেষণ করতে হলে হিন্দি সাহিত্যের রূপরেখাটি মেনে নেওয়া দরকার। আমরা জানি সাহিত্যের যে—কোনো আন্দোলন দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি। কবীর যে এমন মানসিকতাসম্পন্ন হয়ে উঠলেন তার অন্তরালে আছে হিন্দি কবিতা এবং হিন্দি সাহিত্যের পরিশুদ্ধ পরিমণ্ডল, যদিও হিন্দি সাহিত্যের উদ্ভব এবং বিকাশের সময়সীমা খুব একটা পুরোনো নয়, কিন্তু সেই স্বল্প সময়সীমার মধ্যে একাধিক কবি হিন্দি ভাষায় কাব্য রচনা করে স্মরণীয় হয়েছেন। তাঁরা সহজ—সরল জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁদের লেখনীর মধ্যে এক ধরনের দার্শনিক চিন্তার স্ফুরণ

চোখে পড়ে। কবীর হয়তো অজ্ঞাতসারে এইসব পূর্বসূরীদের দ্বারা অল্পবিস্তর প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর মনন এবং মানসিকতায় এসব কবিদের ছাপ পড়েছিল। তা না হলে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও কবীর কীভাবে এমন দার্শনিক তত্ত্ব সমৃদ্ধ দোঁহা লিখলেন! যাঁরা কবীরের অলৌকিকতায় বিশ্বাসী তাঁরা জোর গলায় বলেন এসবই হল মহাশক্তিমান পরম স্রষ্টার একান্ত আশীর্বাদ। আবার যাঁরা তার্কিক বোধবুদ্ধির অধিকারী, যাঁরা মনে করেন পৃথিবীর সমস্ত ঘটনার অন্তরালে আছে ধারাবাহিক পারম্পর্য, তাঁরা বলেন কবীরের মননে অজ্ঞাতসারে পূর্ববর্তী কবিদের চেতন সংবাহিত হয়েছিল। তাঁদেরই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কবীর কলম ধরেছিলেন। তাই তথাকথিত শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও তিনি এমন মনমাতানো দোঁহা লিখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কবীরের এই কবি মানসিকতার উন্মোচনে আসুন আমরা সংক্ষেপে হিন্দি সাহিত্য জগতের কথা শুনে নিই। আমরা দেখি এভাবে বিভিন্ন সময়ে হিন্দি সাহিত্যের বিখ্যাত কবীরা তাঁদের শাশ্বত কবিতার মাধ্যমে মানুষের জীবনকে উন্নত করার চেষ্টা করেছেন।

কবীরপন্থী নির্গুণ ধারার সাহিত্য সাধকেরা বৈরাগ্য ভাবনার ওপর বেশি জোর দিয়েছেন। তাঁরা সাংসারিক যে—কোনো বিষয়ের প্রতি সম্পূর্ণ নির্লিপ্তি প্রদর্শন করেছেন। তাঁরা জানেন জাগতিক কোনো বিষয় চিরকাল একইরকম থাকতে পারে না। তাই তাঁরা ঐশ্বরিক নশ্বরতার সন্ধান করেছেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যোগমার্গ এবং ভক্তিমার্গে বৈরাগ্যের প্রবেশ এবং সাধনা সম্ভব। সন্তেরা এই দুটি পন্থাই পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। তাই বৈরাগ্য ছিল তাঁদের অভীষ্ট সাধনা। এর পাশাপাশি তাঁদের শাস্ত্র ভাবনাতে মত এবং পন্থার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাঁরা ভক্তির শাস্ত্রীয় দিকটি অন্বেষণ করতে গিয়ে গীতা, ভাগবতের আশ্রয় নিয়েছিলেন। আশ্রয় নিয়েছেন নারদীয় ভক্তিসূত্রের। এছাড়া বৈষ্ণব এবং শৈবশাস্ত্রের সঙ্গেও তাঁদের নিগূঢ় যোগসূত্রতা ছিল। কবীরপন্থীরা প্রেমভক্তি বা ভাবভক্তি কিংবা নারদীয় ভক্তির কথা সেভাবে উল্লেখ করেননি। কিন্তু তাঁরা নিরাকার, নিরঞ্জন, অলক্ষ রাম ভাবনার কথা বলেছেন। তাই কবীরের এই নিরাকারী রামকে ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিতে জানবার জন্য ভক্তিতত্ত্বকে উপলব্ধি করতে হবে। ভক্তিতত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব না হলে আমরা রামের সর্বশক্তিমান এবং সর্বব্যাপক রূপটি বুঝতে পারব না।

কবীরপন্থীদের যোগসাধনা এবং ভক্তিসাধনা বিচার করে আমরা একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। আমরা অনায়াসে বলতে পারি যে তাঁরা সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মতাবলম্বী ছিলেন না। তৎকালীন সমাজে যে শাস্ত্র—বিরোধিতার জন্ম হয়েছিল, তা দেখে কবীরপন্থীরা মনে প্রাণে দুঃখ পেতেন। তখনকার রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা তাঁদের মন আকাশকে ঘন মেঘে সমাচ্ছন্ন করেছিল। তাঁরা এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্য ভক্তিবাদকে আশ্রয় করেছিলেন। কবীরের মতো নানক, রুইদাস, দাদু বা মনুকদাসও সংকীর্ণতার বিরোধিতা করে গেছেন। কবীর এমনই স্পষ্টবাদী উগ্র স্বভাবের সন্ত ছিলেন যে, তিনি এই শাস্ত্র বিরোধিতার প্রতিবাদ করতে গিয়ে শুধুমাত্র নিষেধই করেননি, তিনি তাঁর কলমকে তরবারির মতো শাণিত করেছেন। কবীরের ওজস্বী বাণীতে নৈতিকতার সঙ্গে দৃঢ়তার বহিঃপ্রকাশ থাকত। তাই শ্রোতারা সচকিত এবং আতঙ্কিত হয়ে পড়তেন।

সে যুগের সমাজে মৌলবাদকে ধ্বংস করার জন্য কবীর আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেন। বাহ্য আড়ম্বরের বিরুদ্ধে কঠোর শব্দ প্রয়োগ করেন। অন্যধারায় সন্ত রুইদাস এবং নানক কর্মকাণ্ডের মিথ্যা আড়ম্বরকে পরিত্যাগ করতে বলেছেন। তবে তাঁদের ভাষা অনেক সংযত। তাঁরা প্রতিবাদ না করে মিথ্যা আড়ম্বরের প্রতি নিষেধবাণী ঘোষণা করেছেন। তাঁরা স্বীকার করেছেন যে ঈশ্বরপ্রাপ্তির জন্য ভক্তি তত্ত্ব, প্রেম সমতা প্রভৃতি ভাবের সমন্বয় থাকা দরকার। তাঁদের সকলের সমবেত প্রয়াসে মধ্যযুগে সমগ্র ভারত জুড়ে এক সামাজিক বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই বিপ্লবের প্রভাব এবং প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ থাকে।

নির্গুণ ধারার অনুকূল সন্তেরা জীবনব্যাপী সাধনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে একটি সমন্বয়ের দৃষ্টি পরিলক্ষিত হয়। ধর্ম, দর্শন, উপাসনা, আচার, বিচার সবকিছুর মধ্যে তাঁরা সংযোগমূলক সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন।

তাঁরা চেয়েছিলেন এই সমন্বয় যেন সমাজে বসবাসকারী সমস্ত মানুষের প্রতি প্রযুক্ত হয়। কবীর, নানক, দাদু প্রভৃতি সন্তরা ছিলেন মানবতাবাদী দার্শনিক। তাঁরা শুধু নিজেদের স্বীকৃতি অর্জনের জন্য সাধনা করেননি অথবা নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য কঠিন কঠোর অনুশাসনের সাহায্য নেননি, তাঁরা চেয়েছিলেন তাঁদের সাধনলব্ধ ফল যেন সমাজের একেবারে নিম্নবর্গ মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। আজ আমরা সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা বলে থাকি, ভাবতে অবাক লাগে আজ থেকে অনেক বছর আগে মধ্যযুগের সন্ত কবীরা এই সর্বধর্ম সমন্বয়ের ডাক দিয়েছিলেন। তাঁরা যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করে এই সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রকাশ করেন। দর্শনের ক্ষেত্রে তাঁরা শঙ্করের অদ্বৈত সাধনাকে গ্রহণ করেছিলেন। নাথ এবং সিদ্ধ সম্প্রদায়ের বাণীতে যেসব তত্ত্ব পাওয়া যায় তা কিন্তু কোনো সংকীর্ণ মতবাদ দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল না। সন্তরা মানবতাবাদী দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। তাঁদের ছিল নিজস্ব স্বাধীন চিন্তা, অনুভব এবং আচরিত সত্য। তাঁরা সদা সর্বদা সৎচরিত্রকে বজায় রেখেছেন। পরদুঃখে কাতর হতেন, সকলকে করুণা এবং প্রেম নিবেদন করতেন। ভক্তি এবং বিনয় ছিল তাঁদের জীবনের আদর্শ। প্রায় সমস্ত সন্তই ছিলেন সৎজীবী কিন্তু শুধুমাত্র নিজের পরিবার ও পরিজনের ভরণ পোষণের কথা চিন্তা করতেন না। সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষই হলেন তাঁদের পরিবারের অন্তর্গত। এইভাবেই তাঁরা তাঁদের মানসিক দৃষ্টিকোণকে সংকীর্ণ করে রাখেননি।

উত্তর ভারতে ভক্তিবাদকে সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন স্বামী রামানন্দ এবং তাঁর শিষ্য কবীর। কবীর অনুভব করেছিলেন যে শাস্ত্রনিষ্ঠার সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা যুক্ত হয়, শাস্ত্র এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে কোনো লাভ নেই। তাহলে আমরা সকলের কাছে পৌঁছোতে পারব না। কবীর বিশ্বাস করতেন যে, ভক্তির দুটি বড়ো প্রতিবন্ধকতাই হল শাস্ত্র এবং সম্প্রদায়। তিনি তাঁর ধারণাকে বা চিন্তাভাবনাকে তাই সহজ—সরল ভাষায় প্রকাশ করেন।

কবীর জাতি, বর্ণ, ধর্ম, সম্প্রদায় এবং মতবাদের শৃঙ্খল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। ব্যক্তিগত সাধনার সঙ্গে সমষ্টিগত সাধনার মিশ্রণে এমন এক সর্বাত্মক মতবাদের জন্ম দিয়েছিলেন যা সমাজের সকল শ্রেণির মানুষকে আকর্ষণ করে। ধর্মের উপদেশ দান, সন্তদের জীবিকা বা ব্যবসা ছিল না। জীবিকার জন্য তাঁরা অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করতেন। অনেকে আবার পারিবারিক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যেমন কবীর তন্তুবায়ের কাজ করতেন। রুইদাস জুতো সেলাই করতেন, রামদেব ছিলেন পেশায় একজন দর্জি। এই জাতীয় কায়িক পরিশ্রমের জন্য তাঁদের মনে কোনো হীনমন্যতার জন্ম হত না। তাঁরা সারা জীবন ধরে এমন এক মতবাদ বা ধর্ম সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করেছেন যা চিরন্তন ভারত—সভ্যতার প্রতিভূ হতে পারে। সন্তদের আচরিত ধর্মকে আমরা এক শাশ্বত ও চিরকালীন সত্য বলে বলতে পারি। এই সত্য যুগে—যুগান্তরে, কালে—কালান্তরে ভারত আত্মার সঙ্গে একীভূত হয়ে বিরাজ করেছে, এই সত্য অবলম্বন করে ভারতবাসীরা আত্মিক ভাবনায় পরমানন্দে সুখ লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাই আমরা কবীর এবং তাঁর মতো অন্য সমন্বয়কারী সাধকদের কথা সদা সর্বদা শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করব।

হিন্দি সাহিত্যের উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে হলে প্রাকৃত ভাষা এবং অপভ্রংশ ভাষাগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত। অপভ্রংশ শব্দের উৎপত্তি এবং জৈন লেখকদের অপভ্রংশ রচনার সঙ্গে হিন্দির সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়, অপভ্রংশ থেকেই হিন্দি ভাষার উদ্ভব হয়েছে বলে অনেক ভাষাবিদ মনে করেন। প্রাকৃতিক শেষ পর্যায়ের অপভ্রংশ অবস্থা থেকেই হিন্দি সাহিত্যের আবির্ভাব। সেই সময়ে অপভ্রংশের অনেকগুলি রূপ ছিল। সপ্তম, অষ্টম শতাব্দী থেকেই গদ্য রচনা শুরু হয়েছিল। সাহিত্যের দৃষ্টিতে বদ্ধ যে রচনা দেখতে পাওয়া যায় সেগুলি 'দোঁহা' হিসাবে পরিচিত। তার বিষয়বস্তুতে ধর্মের ইতিকথা এবং উপদেশই ছিল প্রধান। রাজাদের আশ্রিত কবি এবং চারণেরা নীতিকথা, শৃঙ্গার, সৌর্য, পরাক্রম প্রভৃতি বিষয়ে অসংখ্য দোঁহা বা ছোটো ছোটো কবিতা রচনা করেছেন। এই রচনা পরম্পরা পরবর্তীকালে সৌরসেনী অপভ্রংশ বা প্রাকৃতাভাষ হিন্দিতে কিছুদিন চলতে থাকে। পুরোনো অপভ্রংশ এবং অর্থ দেশী ভাষার ব্যবহারও বাড়তে থাকে। বিদ্যাপতি এই ভাষাকে দেশজ ভাষা বলে ব্যাখ্যা করেছেন। এই

ভাষার জন্য হিন্দি শব্দের প্রচলন হয় এবং কোন দেশ থেকে শুরু হল সেই বিষয়টি এখনও পর্যন্ত আমরা জানতে পারিনি। তবে একথা অবশ্যই বলা যায় যে, শুরুতে বিদেশী মুসলমানরাই হিন্দি শব্দের প্রথম প্রয়োগ করেছিলেন। এই শব্দের সাহায্যেই তাঁরা ভারতীয় ভাষাকে বোঝাতে চাইতেন।

কালক্রমে আজ হিন্দি ভারতের এক বিশাল ভূখণ্ডে মানুষের কথ্য এবং সাহিত্য—ভাষা হিসাবে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। রাজস্থান এবং হরিয়ানা রাজ্যের পশ্চিম সীমা থেকে বিহারের পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত এবং উত্তরপ্রদেশ ও হিমাচল প্রদেশের পূর্ব সীমান্ত থেকে মধ্য প্রদেশের দক্ষিণ সীমানা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের সাহিত্যের ভাষাকে আমরা হিন্দি বলে থাকি। তবে এইসব প্রদেশে অনেক আঞ্চলিক কথ্য ভাষাও প্রচলিত আছে। সকল ভাষার শাস্ত্রীয় গঠন কিন্তু এক ধরনের নয়। সাহিত্যেও একই ধরনের বাচনরীতি অনুসৃত হয় না। কিন্তু বিদ্বান ব্যক্তিরা এই বিস্তৃত অঞ্চলের সাহিত্যকর্মের সঙ্গে ব্যবহৃত ভাষা বা ভাষাগুলিকেই হিন্দি বলে আসছেন। হিন্দি সাহিত্যের ইতিহাসে হিন্দি শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়। যে সুবিশাল ভূখণ্ডটিকে বর্তমানে হিন্দি ভাষাভাষী রাজ্য হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে তার কোনো একটির নাম নির্ধারণ করা খুব একটা সহজ নয়। তবে এর প্রধান অংশকে মধ্যদেশ বলা হয়ে থাকে।

হিন্দি সাহিত্যের ইতিহাসের রচয়িতারা অপভ্রংশ ভাষার সাহিত্যকে হিন্দিভাষার পূর্ববর্তী রূপ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বিচার বিবেচনা করে বলেছেন যে হিন্দি সাহিত্যে আদিকালের সূচনা হয়েছিল প্রায় ১০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে। পরবর্তী ৫০০ বছর ধরে ছিল এই আদিকালের পটভূমি। যেহেতু অপভ্রংশ ভাষা থেকেই হিন্দির উৎপত্তি, তাই আদিকালের রচিত সাহিত্যের ভাষাও ছিল প্রায় অপভ্রংশ ভাষারই কাছাকাছি। ধীরে ধীরে কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় এবং গ্রহণযোগ্যতায় পরিবর্তন আসে। ভাষাতেও সেই পরিবর্তনের ছাপ পড়ে। ভাষার অপভ্রংশে ব্যাকরণগত ব্যবহার কমে যায়। হিন্দির নিজস্ব রূপেরই বিকাশ লক্ষ করা যায়। ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে পৌঁছোনোর পরেই হিন্দি ভাষা তার নিজস্বরূপ গ্রহণ করে। তখন থেকেই অপভ্রংশ রূপটি রচিত হতে থাকে। আমরা যখন কবীরের দোঁহা সম্পর্কে আলোচনা করব, তখন হিন্দি সাহিত্যের অধিকার বিষয়ে দু—একটি কথা জেনে নিতে হবে।

হিন্দিভাষার সাহিত্যের রূপ যেভাবে বিকশিত হয়েছিল তার বীজ দশম শতাব্দীতে পরিলক্ষিত হয়। পরিশীলিত অপভ্রংশ রূপ দশম শতাব্দীর পরে কথ্য ভাষায় লিখিত সাহিত্যে পাওয়া যায়। হিন্দি সাহিত্যের ইতিহাসের লেখকরা হিন্দি সাহিত্যের আদিকাল হিসাবে ১০৫০ তম সংবাদ বা ৯৯৯ খ্রিস্টাব্দকে চিহ্নিত করেছেন।

এই সময়ে একাধিক হিন্দি কবীর রচনা পরিলক্ষিত হয়। অপভ্রংশের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন স্বয়ম্ভু। তিনি অসংখ্য কবিতা লিখে হিন্দি সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। স্বয়ম্ভু ছিলেন মান্যক্ষেত্রের এক প্রভাবশালী রাজা। মহামন্ত্রী ছিলেন তাঁর সভাকবি। তিনি নিজেকে আল্লা বলে চিহ্নিত করেছেন।

দশম শতাব্দীতে জৈন কবি 'আল্লার কর্ণামৃত' নামে এক চরিত্রকাব্য রচনা করেন। তার পাশাপাশি আরও বেশ কিছু জৈন কবিকে আমরা দেখেছি।

খ্রিস্টীয় নবম—দশম শতাব্দীতে মৎস্যেন্দ্রনাথ এবং গোরক্ষনাথ ছিলেন সিদ্ধ কবি। তাঁদের চুরাশি সিদ্ধদের অন্যতম হিসাবে মান্যতা দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে তাঁরা শিবের অবতার রূপে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। গোরক্ষনাথ অত্যন্ত শক্তিশালী ধার্মিক নেতা ছিলেন। তিনি কট্টরভিত্তিক নাথ সম্প্রদায় সংগঠন করেছিলেন। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে এই সম্প্রদায়ের অসংখ্য মানুষ বসবাস করতে শুরু করেন। তাঁরা তাঁদের সঙ্গে নাথ সম্প্রদায়ের ভাষা এবং সাহিত্যকে বহন করেছিলেন। নাথপন্থীদের কিংবদন্তি থেকে গোরক্ষনাথ সম্পর্কে অনেক কথা জানতে পারা যায়। তিনি বহু জৈন এবং যোগ সম্প্রদায়কে ভেঙে বারোপন্থী শাখা স্থাপন করেন। এই বারোপন্থী যোগমার্গে জলন্ধর এবং বিরচকের মতো কাপালিকরাও ছিলেন। ছিলেন জৈন, বৈষ্ণব এবং শাক্ত সাধকেরা, 'বর্ণ রত্নাকর' নামে চতুর্দশ শতাব্দীর এক মৈথিলী গ্রন্থে ৮৪ জন সিদ্ধপুরুষের নাম দেওয়া হয়েছে, অনেক সিদ্ধপুরুষ বজ্রজানিশ ধারার সিদ্ধদের সঙ্গে ছিলেন অভিন্ন।

নাথ সম্প্রদায়ের সৃষ্ট সাহিত্য হিন্দি সাহিত্যের প্রাথমিক পর্বকে আলোকে উদ্ভাসিত করেছে। গোরক্ষনাথের সময়ে যে কখন ছিল তা নিয়ে বিদ্বানদের মধ্যে বিতর্ক আছে। কেউ বলে থাকেন তিনি ছিলেন প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীর মানুষ। অনেকে বলে থাকেন তাঁর জন্ম হয়েছিল অষ্টম বা দশম শতাব্দীর মধ্যে। কেউ আবার তাঁকে দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কোনো সময়ের মানুষ বলে চিহ্নিত করেন। যে—সমস্ত সম্প্রদায়কে গোরক্ষনাথ নিজে তাঁর বারোপন্থী শাখায় সম্মিলিত করেছিলেন তাঁদের প্রবর্তকদের সঙ্গে বিভিন্ন প্রবাদ ও প্রবচনে গোরক্ষনাথকে সম্মিলিত করার ফলেই এমন বিতর্কের অবতারণা হয়। দশম শতাব্দীর বিখ্যাত কাশ্মীরি আচার্যও তাঁর তন্ত্রলোকে মৎসেন্দ্রনাথের বর্ণনা করেছেন। তাতেই প্রমাণিত হয় যে, মৎসেন্দ্রনাথ দশম শতাব্দীর আগেই অবতরণ করেছিলেন। তিব্বতী পরম্পরায় আবার তাঁকে দশম শতাব্দীর গুরু হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেহেতু গোরক্ষনাথ ছিলেন মৎসেন্দ্রনাথের শিষ্য তাই তিনি ওই সময়েই পৃথিবীতে এসেছেন বলে মনে করা হয়। হিন্দিতে গোরক্ষনাথের নামে প্রচলিত অসংখ্য পদ দেখতে পাওয়া যায়। বেশ কিছু আবার সংস্কৃত ভাষায় লেখা। অনেকে মনে করে থাকেন গোরক্ষনাথ একদল কবীর অলংকারী উপাধি। আসল গোরক্ষনাথ হয়তো তাঁদের মধ্যে আদিকবি হিসাবে চিহ্নিত।

গোরক্ষনাথের নামে যে—সকল পদগুলি পাওয়া গিয়েছে তাদের তাত্ত্বিক এবং আধ্যাত্মিক মৌলত্ব খুব একটা কম নয়। তার মধ্যে কিছু কিছু পদ আবার প্রাচীন, আবার কিছু পদে কবীরের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কোনো কোনো পদে আবার নানকের নামও পাওয়া যায়। দাদু ও রঙ্গনাথের নামেও বেশ কিছু পদ পাওয়া গেছে। কিছু পদে লোকগাথার প্রত্যক্ষ প্রভাবও লক্ষ করা যায়। কিছু কিছু পদ চারণগীতি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আবার কিছু পদ অনুভূতিলব্ধ শাশ্বত জ্ঞানের প্রতীকস্বরূপ জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। গোরক্ষনাথের পদে বিভিন্ন যোগীদের উপদেশ বর্ণিত হয়েছে। এই পদগুলির মধ্যে একটি ভক্তিমূলক ভাবধারা দেখতে পাওয়া যায়। প্রতিটি পদের সঙ্গে একটি করে নীতিকথা সংযুক্ত হয়েছে। আবার অনেক পদ আছে যা বিশ্লেষণ করলে আমরা পদকর্তার অনুভূতির কথাটিও জানতে পারি। গোরক্ষনাথের পদ থেকেই হিন্দি সাহিত্যে আধ্যাত্মিক সাহিত্যধারার সূচনা হয়।

প্রাচীন সিদ্ধদের নামে বেশ কিছু হিন্দি রচনা পাওয়া গেছে যা নাথ সিদ্ধদের বাণী বা বচন হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে। এঁদের মধ্যে অজয় পাল, গোপী চন্দ্র, জলন্ধী, কাকগী, চর্বকনাথ, চৌরঙ্গীনাথ, সিদ্ধনাথ, মহেন্দ্রনাথ, মকরসিদ্ধ, প্রভৃতি প্রাচীন বাকসিদ্ধদের বাণী আছে। কিছু কিছু বাণীর ভাষা এবং শৈলী সন্দেহজনক। কিন্তু বেশির ভাগ বাণী এবং ভাষা বিশ্লেষণ করলে আমরা বুঝতে পারি সেগুলি দশম শতাব্দী কালের রচনা।

যাঁরা হিন্দি সাহিত্যের বিষয় নিয়ে গবেষণা করে থাকেন তাঁরা এই জাতীয় পদগুলির ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য এবং কাব্যিক রসধারার ওপর নানাভাবে আলোকপাত করেছেন। তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতে আমরা গোরক্ষনাথের পদ সম্পর্কে অনেক কথা জানতে পেরেছি।

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, গোরক্ষনাথের পরবর্তী ধারায় হিন্দিতে ভক্তিকালের শুভ সূচনা হয়। ভক্তিবাদের প্রাবল্য দেখা গিয়েছিল কবীরের দোঁহার মধ্যে। কবীর অবশ্য স্বসৃষ্ট ধারার পথিক হয়ে তাঁর দোঁহাতে জ্ঞানমার্গ এবং ভক্তিমার্গ—এর আশ্চর্য সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। তাই কালের যাত্রাপথ অতিক্রম করে আজও আমরা পরম বিস্ময়ে ঔৎসুক্যের সঙ্গে তার দোঁহাগুলি পাঠ করে থাকি।

ভক্তি মানুষের এক জন্মগত প্রবণতা। এই ভক্তি ব্যক্তির বিশ্বাস এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। অন্তরের মধ্যে নিহিত ভক্তিবাদ বা শ্রদ্ধার ভাবকে যখন আমরা আমার থেকে অধিক শক্তিশালী ব্যক্তির প্রতি ব্যক্ত করি তখন তাকে লৌকিক শ্রদ্ধা বলা হয়। আর যখন সেই শ্রদ্ধা কোনো অলৌকিক অদৃশ্য শক্তির প্রতি নিবেদিত হয় তখন তাকে ভক্তি বলা হয়। ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তনের রূপটিকে ঈশ্বরের উপাসনাস্বরূপ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। ভক্তি হল আরাধনার প্রেরণা। আমরা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার জন্য তাঁর পুজো করে থাকি। এই পুজোর অন্যতম বিষয় হল ভক্তিভাব। মানুষ তার সীমিত ক্ষমতাবলে এই

বিশ্বের পালন বা রক্ষা করতে সমর্থ হয়। তাই মানুষকেই তাঁর থেকে অধিক শক্তিশালী কোনো এক পরম পুরুষের সন্ধান করতে হয়। এই সন্ধান করতে করতেই মানুষ এক বিরাট সত্তার কথা ঘোষণা করে। এই সত্তা দৃশ্যমান জগতের আবির্ভাব, স্থিতি এবং সংহারের উপলক্ষ বা কারণ। এই চিন্তার থেকেই আত্মিক শ্রদ্ধার উদয় হয়। দার্শনিক সত্তায় এই শক্তিকে ব্রহ্ম শব্দের মাধ্যমে উল্লেখ করা যেতে পারে। আবার অন্যত্র তাঁকে 'ঈশ্বর' বলা হয়েছে। এই ব্রহ্ম নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধিসম্পন্ন। তিনি উচ্চ স্বভাব সম্পন্ন। তিনি সর্বশক্তিমান এবং সর্বব্যাপক। তাঁকে আমরা এমন এক অপরিবর্তনীয় সত্তা হিসাবে ঘোষণা করব যিনি স্থল—জল—অন্তরীক্ষে বিদ্যমান। তাঁর গতিপ্রকৃতি সদা—সর্বদা আমরা আমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে ভক্তি এবং বিশ্বাস নিবেদন করি। ধর্ম এবং সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধারণা অনুসারে ঈশ্বরের বিভিন্ন নামের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে সর্বশক্তিমান এবং সর্বত্রব্যাপী ঈশ্বর এক এবং অভিন্ন। তাঁকে আমরা যে নামেই ডাকি না কেন, কেউ ডাকলেই তিনি সাড়া দেবেন।

ভারতীয় ইতিহাসের মধ্যকালে ঈশ্বরভক্তি বিষয়ক কাব্য এবং সাহিত্য ধারার আবির্ভাব ঘটে যায়। হিন্দি ভক্ত কবীরা পরম্পরাগতভাবে চলে আসা ঈশ্বর ভক্তির বিকশিত ভাবধারাটি সশ্রদ্ধ চিত্তে গ্রহণ করেছিলেন। বিশ্বের সব থেকে প্রাচীন গ্রন্থ ঋকবেদের পাতায় পাতায় ঈশ্বরভক্তির একটি অবিস্মরণীয় রূপ পরিলক্ষিত হয়। কোনো কোনো বিদ্বান ব্যক্তি মনে করেন যে পরবর্তীকালে সংস্কৃত হিন্দি অথবা অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় ভক্তি ভাবনাধারার সেই রূপটি যথাযথভাবে পাওয়া যায় না। তাঁরা বলে থাকেন বৈদিক যুগে রাগাশ্রিত ভক্তি ভাবধারার উদ্ভব হয়নি। তখনকার দিনের বিশিষ্ট ঋষিমুনিরা বিশ্ব সংসারের রহস্য জানার জন্য কর্ম এবং জ্ঞানের তুলনামূলক আলোচনায় ব্রতী হতেন। তাঁরা মনে করতেন খ্রিস্টান, ইসলাম, সুফী মতবাদ অন্যান্য সেমেটিক ধর্মের ভক্তির যে ধারণা স্বীকৃত হয়েছে ভারতীয় ভক্তি সাধনার সেইটি হল উপাস্য রূপ। এই বিচারধারা প্রচারে অনেক বিদেশী বিদ্বান ব্যক্তিও যুক্ত ছিলেন। তবে পরবর্তীকালে তাঁদের মতবাদকে খণ্ডন করা হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় বিদ্বান ব্যক্তি মধ্যকালীন ভক্তিভাব ধারার প্রেমতত্ত্বের আধারটির সঙ্গে সেমেটিক ধর্মের স্বদেশতার কথা ঘোষণা করেছেন। কিন্তু এই ধারণা আমরা সর্বজন স্বীকৃত হিসাবে মানবো না। বহু ভারতীয় জ্ঞানী এই মতবাদকে খণ্ডন করেছেন। তাঁরা একের পর এক প্রামাণ্য বিষয়কে তুল ধরেছেন। আজ ওইসব মতবাদকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। আজ আমরা অনায়াসে বলতে পারি যে, ভারতীয় ভক্তিসত্তার বিকাশ ভারতীয় মতবাদের প্রভাবেই ঘটেছিল। পাশ্চাত্য মনীষী গোয়েবেলসও কৃষ্ণকে যীশুখ্রিস্টের রূপান্তর বলে ঘোষণা করেছেন। জর্জ অরওয়েল তাঁর প্রবন্ধে এই ভ্রান্ত ধারণার উল্লেখ করেছেন। এইভাবে তাঁরা যীশুখ্রিস্টের মহিমাকে প্রচার করতে চেয়েছেন। প্রাচীন ভারতীয় বিচারধারা অনুসারে আমরা কখনোই এই কথাটিকে সত্যি বলে মানবো না।

আমাদের বৈদিক সাহিত্যের পাতায় পাতায় ভক্তিরসধারা আশ্রিত অসংখ্য কবিতা দেখতে পাওয়া যায়। বেদগ্রন্থে এমন কিছু শ্লোক আছে যেগুলি নির্গুণ, নিরাকার ব্রহ্মের বর্ণনাস্বরূপ রচিত হয়েছে। ঈশ্বরের আরাধনা, উপাসনা এবং বন্দনা করার জন্যই এগুলির রচনা। তাই আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি ঋকবেদ হল ভারতীয় ভক্তিভাবের আদি উৎস। ঋকবেদের কিছু মন্ত্রে মানুষ এবং দেবতার মধ্যে নিবিড় প্রেম এবং মৈত্রীর ভাবেরও কল্পনা করা হয়েছে। বৈদিক কালের উপাস্য দেবদেবীর নামের কোনো সীমা নেই। কিন্তু অনেক নামেই এক ঈশ্বরের ভক্তির নির্দেশ আছে। বেদগ্রন্থে দার্শনিক, আধ্যাত্মিক এবং আধিভৌতিক প্রভৃতির চিন্তাধারা দেখতে পাওয়া যায়। এই চিন্তাধারার মধ্যে ভক্তিবাদের বীজ নিহিত আছে একথা অনায়াসে বলা যেতে পারে।

মনীষীরা বৈদিক সাহিত্যের এই ভক্তিবাদের পরবর্তী ৯টি রূপের বীজ খোঁজার চেষ্টা করে থাকেন। ভাগবতেও এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। ঈশ্বরকে কখনো আমরা পিতা অথবা মাতা হিসাবে শ্রদ্ধা করি, কখনো ঈশ্বর বন্ধু বা সখা হিসাবে আমাদের পাশে এসে দাঁড়ান। বিষ্ণুর সর্বব্যাপিতা, সর্বশক্তি সত্তা এবং সৃষ্টি ও রক্ষাকর্তা হিসাবে অসংখ্য মন্ত্র রচিত হয়েছে। যদি আমরা ঋকবেদ থেকে শুধুমাত্র ভক্তি

বিষয়ক মতগুলিকে আলাদাভাবে চয়ন করি, তাহলে তার সংখ্যাটা হবে বিশাল। এই ভক্তিবাদের মধ্যে একদিকে নির্গুণ ঈশ্বরের অবতারণা করা হয়েছে, অন্যদিকে আছে সগুণ ভক্তিবাদ।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থে কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রেও ভক্তির বিধান পরিলক্ষিত হয়। ঐতরেয় এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে এই ভক্তিকেই সর্বোচ্চ স্থানে উন্নীত করা হয়েছে। বিভিন্ন উপনিষদেও এই প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

উপনিষদের কাল থেকে আমরা যদি সামনের দিকে এগিয়ে যাই তাহলে দেখব ভক্তির বিভিন্ন রূপ পরিলক্ষিত হচ্ছে। অবতারবাদের কল্পনা করার পর ভক্তির নানান উপাস্য দেবতার সৃষ্টি হয়েছে। ভক্তির ক্ষেত্রে পরবর্তী সাহিত্যে নাম, জপ, ব্রত, উপাসনা প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়। উপনিষদের পরে ভক্তির প্রবল ধারা ভাগবতধর্ম হিসাবে প্রবাহিত। মহাভারতের কালে নারায়ণ শাশ্বত ভাগবত প্রপঞ্চ, সিদ্ধভক্ত ইত্যাদি নামে নানা ভক্তি সম্প্রদায়ের কাছে প্রচলিত হয়েছিল। তাঁদের উপাস্য দেবতায় মূল ভক্তিভাবনা অক্ষুণ্ণ থেকেছে।

কুশান এবং বুদ্ধযুগে ভাগবত ধর্মের বিভিন্ন ধারার বিকাশ ঘটে। গবেষকদের মতানুসারে লোকে বিষ্ণু এবং তাঁর মহাযোগী অচ্যুত শব্দে পুরুষ ও অনিরুদ্ধের উপাসনা করেছেন। শাক্য সম্প্রদায় কৃষ্ণকে নারায়ণ রূপে উপাসনা করতেন। পাঞ্চজন্য তত্ত্বের অনুসারীরা বাসুদেব, শভর্ষণ, প্রদ্যুম্নের এবং অনিরুদ্ধ রূপের চতুষ্কর বিষ্ণুর উপাসক, মহাভারতের শাশ্বতদের বর্ণনা আছে। এই অংশকে অবশ্য প্রক্ষিপ্ত বলে গণ্য করা হয়। মহাভারতের এই উপাখ্যান বিশ্বকে শোনানো হয়েছিল। তাই আমরা বলতে পারি, ভারতের ভক্তি ভাবনার যে ধারা বৈদিককালে প্রভাবিত হয়েছিল তা মহাভারতের কাল পর্যন্ত সতত প্রবহমান ছিল।

ভাবগত ধর্মের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের অবতার রূপের ধারণা করা হল। সাধক—সাধিকারা মনে করলেন যে ঈশ্বর হলেন সৎ গুণের আধার। ঈশ্বরের মধ্যে যে ছ'টি গুণ আছে সেগুলি হল যথাক্রমে—জ্ঞান, বল, ঐশ্বর্য, বীর্য, শক্তি এবং তেজ। এই প্রতিটি গুণের আবার আলাদা একটি মাত্রা বা দ্যোতনা আছে। এখানে জ্ঞান অর্থে সেই পারমার্থিক জ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে যা আমাদের চিত্তকে শুদ্ধ করে এবং আত্মাকে করে আলোকে উদ্ভাসিত। বল অর্থে সেই অসীম বলের কথাই বলা হয়েছে। যার দ্বারা আমরা রিপু দমন করতে পারি। ঐশ্বর্য অর্থে কিন্তু কোনো বৈষয়িক ঐশ্বর্যের কথা বলা হয়নি। পৃথিবীর মানুষ এক অনন্ত ঐশ্বর্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য যে সে এই ঐশ্বর্য সম্পর্কে মোটেই অবগত নয়। এখানে সেই ঐশ্বর্যের কথাই তুলে ধরা হয়েছে। বীর্য বলতে অমিত শক্তির আধারকে চিহ্নিত করা হয়েছে। শক্তি অর্থে সেই সদর্থক এবং ইতিবাচক শক্তির কথা বলা হয়েছে। যার দ্বারা মানুষ অশুভকে দমন করতে পারবে। তেজ হল সূর্য—সদৃশ্য প্রচণ্ডতা এবং উগ্রতা। যার দ্বারা মানুষ তার সমস্ত কলুষতাকে দূর করতে পারে!

অবতারবাদের এই কল্পনাকে পুরাণগুলি বেশ ব্যাপকভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই আলাদাভাবে ভাগবৎ পুরাণের কথা বলব। দশ অবতারের বর্ণনায় ভক্তিবাদের দীপ্ত বহিঃপ্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। অবতাররূপী ভগবানকে যখন থেকে আমরা এই রূপে প্রত্যক্ষ করি তখন ভক্তির একটি সগুণ আকার আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়, মধ্যকালীন ভক্তকবীরা রামকৃষ্ণের অবতার রূপের বিষয়ে একাধিক 'মিথ' রচনা করেছেন। নির্গুণ ধারার কবীরা অবশ্য ঈশ্বরের এই অবতারতত্ত্বকে অস্বীকার করাকে স্বীকার করেছেন। কিন্তু তাঁরা ভক্তিরস থেকে প্রেম ও অনুরাগ জাতীয় প্রণোদনাকে বাদ দিতে পারেননি। এটি সগুণ—নির্গুণ বিভেদের ওপরে অবস্থিত এক সর্বজনস্বীকৃত ভক্তির পথ।

ভাগবত পুরাণের পাতায় পাতায় ভক্তিবাদের উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশ সম্পর্কে নানা পদ রচিত হয়েছে। একটি পদ পড়লে আমরা ভক্তির উৎপত্তি ও বিকাশের সংকেত জানতে পারি। একটি প্রচলিত কিংবদন্তি সূত্রে ভক্তির উৎপত্তি দক্ষিণ ভারতে হয়েছে বলে বলা হয়। ক্রমশ তা উত্তর ভারতে বিকশিত হতে থাকে। আবার অনেকে বলে থাকেন এইভাবে ভক্তিবাদকে কোনো একটি অঞ্চলের আঞ্চলিক অভীধায় অভিষিক্ত করে লাভ নেই। এক সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষের সর্বত্র ভক্তিবাদের বিচ্ছুরণ চোখে পড়েছিল। ভারতের সমস্ত প্রান্তে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভক্তিবাদ বিকশিত হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে আমরা দক্ষিণ ভারতের আলবার সম্প্রদায়ের কথা আলাদাভাবে বলব। তাঁদের সময়কাল দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে নবম শতাব্দী পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। আবার অনেকে মনে করে থাকেন যীশুখ্রিস্টের জন্মের আড়াইশো বছর আগে আলবার সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। প্রাথমিকভাবে আলবার বিষ্ণুর গদা, শঙ্খ এবং চক্রের অবতার ছিলেন। আলবাররা বংশানুক্রমিকভাবে ভক্তি—সাহিত্য রচনা করেছেন। এই সম্প্রদায়ের শেষ ভক্ত হলেন তিরুপানি।

আলবারের পরে আলবারের এক দত্তক—পুত্রী হলেন অন্দাল। তাঁর ভক্তিগীতি প্রেমপূর্ণ ভক্তিরসে পরিপ্লাবিত। এই ভক্তিকে আমরা বৈষ্ণব কান্তাভাব বলতে পারি। আলবার শব্দের ব্যাকরণগত অর্থ হল 'ঈশ্বরীয় জ্ঞানের মূল তত্ত্বে উপনীত হওয়া'। আলবার সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা বর্ণ এবং নানা বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানুষ আছেন। আলবারদের গ্রন্থকে তামিল দেশের মানুষ বেদের সমান পূজ্য বলে মনে করেন। ভগবান যীশুখ্রিস্টের জন্মের কয়েক শতাব্দী আগে থেকেই এই দক্ষিণ ভারতের বেশ কিছু মানুষের মনে বিষ্ণুভক্তির প্রেমজ্ঞ জ্ঞানের উদ্ভব ঘটে। তাঁদের ভক্তিবাদের মধ্যে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং কান্তা এই চারটি ভাব প্রধান। প্রেমলক্ষণযুক্ত ভক্তি—ভাবনার উদয় বহিরাগতদের প্রভাবে হয়েছে বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁদের এই বিশ্বাস একেবারেই ভ্রান্ত এবং ভিত্তিহীন।

দশম শতাব্দী থেকে ভক্তিরস ও শাস্ত্রকে নানাভাবে বিচার—বিশ্লেষণ করা শুরু হল। আদি শঙ্করাচার্য তাঁর অদ্বৈত সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে 'জ্ঞানমার্গের আশ্রয় ভিন্ন মোক্ষলাভ সম্ভব নয়' বলে এক মতবাদ প্রচার করতে শুরু করলেন। এই সময়ে জ্ঞানমূলক প্রচারের ফলে ভক্তিমার্গে বিচরণকারী মানুষেরা কিছুটা আহত হয়েছিলেন। কিন্তু জ্ঞানমার্গের ধারণা কি ভক্তিমার্গের বিপরীত? শঙ্করাচার্যের বিচারধারাকে স্বীকার করেন না, পরবর্তীকালে এমন অনেকে ভক্তির জন্য নতুন পথের সন্ধান করেন। এই তালিকাতে আছেন রামানুজাচার্য, নিম্বার্কাচার্য, মধ্বাচার্য বিষ্ণুস্বামী এবং বল্লভাচার্য। তাঁদের বিশেষত্ব হল তাঁরা অদ্বৈতবাদী বিচার 'ব্রহ্ম সত্য ও জগৎ মিথ্যা' নামক বিষয়টিকে কখনো স্বীকার করেননি। তাঁরা নিজেদের বিশ্বাসকে যুক্তিপূর্ণ চিন্তাভাবনার দ্বারা বিশ্লেষিত করেছিলেন। স্বীয় স্বীয় ক্ষেত্রে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা এবং সাধনা করে গেছেন। তাঁদের সকলের সমবেত প্রতিষ্ঠায় ভক্তিবাদ এক নতুন প্রতীতি। তাঁদের মতবাদ বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত প্রভৃতি নানা নামে ব্যক্ত হয়।

ভক্তিবাদের ব্যাপক প্রচলন এবং প্রবর্তনে এই সব প্রাতঃস্মরণীয় আচার্যদের অবদানের কথা আমরা কখনো ভুলতে পারব না। তাঁরা বিষ্ণুর অবতার হিসাবে রামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। শ্রীবিষ্ণু হলেন ভক্তির উপাস্য দেবতা। মধ্যকালে সংস্কৃত এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় ভক্তি ও ভাবনার এক নতুন রূপ পরিলক্ষিত হয়। এই আচার্যদের সমবেত প্রয়াসের এই ধারাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁরা ভক্তিকে শাস্ত্রীয় মর্যাদা দান করেন। ভক্তিবাদ এতদিন পর্যন্ত কিছুমাত্র বুদ্ধিজীবীর একান্ত আশ্রয়স্থল বলে পরিগণিত হয়েছিল। এঁদের সমবেত প্রয়াসে ভক্তিবাদ সর্বসাধারণের কাছে সহজলভ্য হয়ে ওঠে।

এই প্রসঙ্গে একান্ত ভক্তিবাদী সাধকের কথা বলব। যেমন রামানুজাচার্য রামতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। রামানন্দ রামচন্দ্রকে আরও ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করেন। জাতিগত ভেদাভেদ দূর করার জন্য আচার্য রামানন্দ ভক্তিবাদের প্রচলন করেন। হিন্দি কবিদের মধ্যে তুলসীদাস হলেন এক অত্যন্ত শক্তিশালী কবি, তাঁর অমর লেখনীর মাধমে রামচন্দ্রের জীবনকথা উত্তর ভারতের অসংখ্য মানুষের মধ্যে পৌঁছে গেছে। বিষ্ণুভক্তির ক্ষেত্রে নির্বাক, মধ্বাচার্য, বিষ্ণুস্বামী, বল্লভাচার্য, কৃষ্ণচৈতন্য, হিত হরিবংশ, হরিদাস প্রমুখ যে প্রয়াসে ব্রতী হয়েছিলেন তার ফলে কৃষ্ণভক্তির ব্যাপকতা লাভ করে।

ভক্তির যে স্রোত বেদ, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, মহাভারত এবং পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে শুরু এবং পরিপুষ্ট হয়েছিল, বংশানুক্রমে তা ছিল সতত প্রবহমান। ভক্ত কবীরা বিষ্ণুর উপাসনা না করে নির্গুণ নিরাকার ঈশ্বরের উপাসক ছিলেন। হিন্দি, গুজরাটি ও মারাঠাদের মধ্যে এই ধরনের অনেক ভক্ত—কবির সন্ধান পাওয়া গেছে। নাথ এবং সিদ্ধ সন্ত সম্প্রদায়ের অনেকেও নির্গুণ ভক্তির দিকেই তাঁদের প্রবণতা লক্ষ করেছেন। এই প্রসঙ্গে

আমরা কবীর, নানক, দাদু, রজ্জব, রুইদাস এবং মলুকদাসের কথাও বলব। তাঁরা সকলেই নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে নির্গুণ ভক্তিবাদের বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। আমরা সাধারণত তাঁদের সন্ত নামে চিহ্নিত করে থাকি।

মহারাষ্ট্রে আবার ভক্তির ক্ষেত্রে সগুণ এবং নির্গুণ ধারাটি প্রচলিত ছিল। জ্ঞানেশ্বর, নামদেব, তুকারাম প্রমুখের রচনায় তার পরিচয় পাওয়া যায়।

বৈষ্ণব—ভক্তির প্রতিষ্ঠাতা হলেন আচার্যরা। বৈষ্ণব—ভক্তির আচার্যদের সময়কাল দশম থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত। রামানুজাচার্য হলেন আচার্যদের গুরু। পরবর্তীকালে নিম্বার্কাচার্য, বিষ্ণুস্বামী, মাধবাচার্য এবং বল্লভাচার্যের জন্ম হয়। এঁরা ছাড়াও আরও অনেকে এই ভক্তিবাদকে যথেষ্ট পরিপ্লাবিত এবং উন্মত্ত করেছেন।

আচার্য রামানুজ অবতাররূপে রামকে নিজের বিষ্ণুভক্তির উপাস্যদেব হিসাবে স্বীকার করেন। তাঁর মতে, পুরুষোত্তম ব্রহ্ম সগুণ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। ভক্তদের অনুগ্রহ করার জন্য তিনি পঞ্চরূপ ধারণ করেছিলেন। পঞ্চরূপের মধ্যে অন্যতম হলেন রাম। ভক্তির মাধ্যমেই যে মুক্তি সম্ভব তা রামানুজাচার্য বিশ্বাস করতেন। হিন্দি সাহিত্যের বৈষ্ণব—কবিদের মধ্যে গোস্বামী তুলসীদাস এই মতবাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। দার্শনিক স্তরে এই মতবাদকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলা হয়। আর এই সম্প্রদায়ভুক্ত সকলকে বলা হয় 'শ্রীসম্প্রদায়'—এর মানুষ।

আচার্য মধ্বা দক্ষিণ ভারতের বেলিগ্রাম নামক অঞ্চলে দ্বাদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিও ছিলেন ভক্তিবাদের এক অনন্য সাধক। বেদান্ত শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা ছিল তাঁর। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাঁর নামকরণ হয় আনন্দতীর্থ। তিনি উত্তর—ভারত ভ্রমণের সময়ে বদ্রিকাশ্রমে এসেছিলেন। বেদব্যাসের কাছ থেকে তিনটি শালগ্রামের মূর্তি লাভ করেন। শিষ্যদের সুবিধার জন্য তিনি সেখানে আটটি মন্দির স্থাপন করেন। মধ্বাচার্য অদ্বৈতবাদের বিরোধী ছিলেন। তাঁর দার্শনিক মতবাদ ছিল দ্বৈতবাদ। তিনি বিশ্বাস করতেন ভগবান বিষ্ণু অষ্টগুণ সম্পন্ন। এই জগৎ সত্য, ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে ভেদ, জীব ও জীবের মধ্যে ভেদ এবং জড় ও জীবের মধ্যে ভেদ এক বাস্তবিক সত্য। মধ্বাচার্যের সম্প্রদায়কে ব্রহ্ম—সম্প্রদায় বলা হয়।

ভারতের ইতিহাসে শ্রীবিষ্ণুস্বামী নামে তিনজন আচার্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে কাকে সঠিক আচার্যের স্থান দেওয়া হবে সেটি এখনও নির্ণয় করা যায়নি। 'সর্বজ্ঞ সূক্তে'র রচনাকারী অনেকে রুদ্র—সম্প্রদায়ের আচার্যকে বিষ্ণুস্বামী বলে থাকেন। তাঁর সময় নির্ণয় করা কিছুটা কঠিন। তিনি বলেছেন ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ স্বরূপে বিরাজ করেন। তিনি আপন আনন্দ—স্বরূপা চেতনার সঙ্গে বিজড়িত। মায়া তাঁরই অধীনে ক্রিয়াশীল থাকে। বিষ্ণুস্বামীর মতে ঈশ্বরের প্রধান অবতার হলেন নৃসিংহ অবতার।

শ্রীনিম্বার্কাচার্যের সময়কালও আজ পর্যন্ত নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। নিম্বার্ক সম্প্রদায় তাঁকে সৃষ্টির আদিপর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে মনে করে। এই সম্প্রদায়ের দার্শনিক মতবাদ হল ভেদাভেদবাদ।

শ্রীনিম্বার্কাচার্য মনে করেন জীব অবস্থাভেদে ব্রহ্ম থেকে পৃথক। আবার তেমনি অভিন্ন ভাবও আছে। এই সম্প্রদায়ের সকলে রাধাকৃষ্ণের যুগল—মূর্তির উপাসনা করে থাকেন। ব্রজমণ্ডলে এই উপাসনার প্রচার আছে। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের অনেক কবিই ব্রজভাষায় অসাধারণ সমস্ত পদ এবং কাব্য রচনা করেছেন।

শ্রীবল্লভাচার্য রায়পুর জেলার চম্পারণে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সমস্ত জীবন উত্তর ভারতের কাশী, প্রয়াগ এবং ব্রজমণ্ডলে অতিবাহিত হয়েছে। তিনি অত্যন্ত তেজস্বী এক ব্যক্তি হিসাবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। এমনকি সম্রাট আকবর পর্যন্ত তাঁর জ্ঞান—গরিমার দ্বারা প্রভাবিত হন।

বল্লভাচার্য সম্প্রদায় এখন স্বতন্ত্র একটি সম্প্রদায় হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছে। এক সময় বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের সঙ্গে এই সম্প্রদায়ের বিশেষ সম্পর্ক ছিল।

দার্শনিক দৃষ্টিভক্তির এই সম্প্রদায়ের মতবাদকে শুদ্ধাদ্বৈত বলা হয়ে থাকে। এই মতবাদ অনুসারে বলা হয় ব্রহ্ম মায়া থেকে সর্বদাই বিচ্ছিন্ন। ব্রহ্ম তাঁর অভেদ শক্তির দ্বারা সৎ, চেতনা শক্তির দ্বারা চিৎ এবং

আনন্দস্বরূপ শক্তির দ্বারা আনন্দের উৎপত্তি করেছেন। ব্রহ্ম সত্য এবং নিত্য। তাঁর উৎপত্তি বা জন্ম হয় না। জীব হল এক অনুবৎ প্রাণী, তার তিনটি প্রকারভেদ। শুদ্ধ জীব, সংসারী জীব এবং মুক্ত জীব।

শুদ্ধাদ্বৈত দর্শন অনুসারে ঈশ্বরের যখন রমণ করার আকাঙ্ক্ষা জাগে তখন তিনি তাঁর নিজের আনন্দ প্রভৃতি গুণের অংশকে তিরোহিত করে জীবরূপ ধারণ করেন। ভগবানের ইচ্ছা হওয়াটাই একমাত্র কারণ, মায়ার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। নিজের মতবাদকে প্রতিপন্ন করার জন্য আচার্য একাধিক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন।

বল্লভ সম্প্রদায়ের প্রচার এবং প্রসারের ক্ষেত্রে বল্লভাচার্যের পুত্র গোস্বামী বিঠল নাথের যোগদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেইসময় মোঘল শাসকের ওপরে তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল। ব্রজমণ্ডলে বৈষ্ণব ধর্মের রক্ষার জন্য তিনি অনেক সাহসিকতাপূর্ণ কাজ করেছেন। উত্তর ভারত থেকে গুজরাট, রাজস্থান প্রভৃতি অঞ্চলে বল্লভ—সম্প্রদায় স্থাপন করা ছিল তাঁর এক অনন্য কীর্তি।

এই দার্শনিক এবং তাত্ত্বিক ভাবধারাকে অনুসরণ করে মধ্যযুগীয় হিন্দি সাহিত্যের উদ্ভব এবং বিকাশ চোখে পড়ে। মধ্যযুগীয় হিন্দি ভক্তিকাব্য সম্পর্কে বিদ্বান ব্যক্তিরা নানাসময়ে নানা ধরনের মন্তব্য করেছেন। মধ্যযুগীয় হিন্দি কাব্যে নির্গুণ এবং সগুণ দুটি ধারার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়। মনে প্রশ্ন জাগে, কেন এইভাবে হিন্দি আধ্যাত্মিক—সাহিত্য এই ধারামুখী হয়ে উঠেছিল! অনেকে বলে থাকেন তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্যই এমনটি হয়েছে।

আচার্য রামচন্দ্র শুক্ল তাঁর 'হিন্দি সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে ভক্তিকাল সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য মতবাদ ব্যক্ত করেছেন। অবশ্য তাঁর মতবাদকে সামগ্রিকভাবে সত্য বলে স্বীকার করা যায় না। আচার্য হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, আচার্য শুক্লর মতবাদকে খণ্ডন করেছেন। আচার্য দ্বিবেদী পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, মধ্যযুগীয় রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে হিন্দি জনসম্প্রদায় হতাশায় আচ্ছন্ন হয়। তখন তারা এক ঐশী শক্তির সন্ধানে আত্মনিয়োগ করে।

শুক্ল আবার মন্তব্য করেছেন কর্মের অভাবে হিন্দুরা অপঙ্গপঙ্গু, জ্ঞানের অভাবে অন্ধ এবং ভক্তির অভাবে হৃদয়হীন এবং মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে। তাই ভক্তিবাদী পুনরুজ্জীবন চোখে পড়ে।

মধ্যযুগের হিন্দি সাহিত্যের সবথেকে বড়ো বৈশিষ্ট্য হল বিভেদ—ভাবনার, দৃশ্যপটকে মুছে ফেলার সার্বিক প্রয়াস। সে—যুগের বাস্তববাদী কবীরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সখ্যের সম্পর্ক বজায় রাখা দরকার।

ইতিমধ্যে নাথপন্থীরা হৃদয়ের পক্ষপাতশূন্য সাধারণ অন্তঃসাধনার সন্ধান করে গেছেন। কিন্তু তাতে মানুষের আত্মা তৃপ্ত হতে পারেনি। মহারাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ ভক্ত নামদেব এই সময় ভক্তিমার্গের আশ্বাস দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে উত্তর ভারতে নির্গুণ পন্থা নামে ভক্তির প্রচলন শুরু হয়। একথা অনায়াসে বলা যেতে পারে যে, কবীর একাধারে নিরাকার ঐশ্বর্যের উপাসনার জন্য ভারতীয় বেদান্তের মত গ্রহণ করেছিলেন। আবার নিরাকার ইশ্বরের ভক্তির জন্য মুসলমান সুফীবাদের প্রেমতত্ত্বকে মেনে নিয়েছিলেন। এই দুই—এর সংমিশ্রণে তৈরি হয় তাঁর নির্গুণ পন্থা।

কবীর এবং অন্য নির্গুণপন্থী সাধকেরা অন্তর্সাধনার ক্ষেত্রে রাগাত্মিকা ভক্তির প্রাবল্যকে স্বীকার করেছেন। তাঁরা ভক্তির সঙ্গে জ্ঞানকে যুক্ত করেছেন। তবে কর্মের ব্যাপারে নাথপন্থীদের অনুসরণ করেছেন। ঈশ্বরের ধর্ম স্বরূপকে কবীর এক অনন্য মাহাত্ম্য দিয়েছেন। ঈশ্বরীয় ধর্মভাবনার স্বভাবেই যে সব রমণীয় অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটে, তা জনসাধারণকে নানা বিপদ থেকে রক্ষা করে— এটাই ছিল মহাত্মা কবীরের আন্তরিক অভিজ্ঞান। কবীরদাস, স্বামী রামানন্দের শিষ্য হয়ে ভারতীয় অদ্বৈতবাদের সাধারণ বিচারধারা গ্রহণ করেন। সুফীদের চিরাচরিত কিছু আচার—আচরণ এবং বৈষ্ণবদের অহিংসাও নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করেন। তাই কবীর প্রবর্তিত নির্গুণবাদের একদিকে যেমন অদ্বৈতবাদের প্রকাশ পরিলক্ষিত হয় তেমন কোথাও কোথাও শ্রুত হয়

সুফীবাদের প্রেমতত্ত্বের কথা। কখনো কবীর পয়গম্বরদের কঠোর ঈশ্বরবাদকে অনুসরণ করেছেন, কোথাও আবার অহিংসাবাদের আশ্রয় নিয়েছেন।

এইভাবেই কবীর নির্গুণ কাব্যধারাকে নানাভাবে বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন করে তুলেছেন। কবীরের দোঁহার আধ্যাত্মিক অন্বেষণে নির্গুণ কাব্যধারার উৎস এবং ক্রমবিকাশের ওপর আলোকপাত করা দরকার। নির্গুণ ভক্তিবাদের উৎপত্তি বিষয়ে এমন কোনো মতপার্থক্য চোখে পড়ে না। ভক্তিক সূত্র বৈদিক ভাষ্যেই খুঁজে পাবার পর আমরা নির্গুণ ভক্তির উৎসটি পেয়ে যাই। কিন্তু প্রধান কথা হল উৎপত্তি নয়, কীভাবে নির্গুণ কাব্যধারা বিকশিত হল সেই বিষয়টি বিচার করা। অনেকেই বলে থাকেন মধ্যকালীন নির্গুণ বিকাশের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের বজ্রযান এবং সহজযান শাখাকে সংযুক্ত করতে হবে। তা না হলে ক্রমবিকাশের এই ধারাটি উপলব্ধি করা সম্ভব হবে না। একসময় ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সহজযান সিদ্ধ পুরুষদের প্রভাব এবং প্রতিপত্তি যথেষ্ট অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁরা সপ্তম শতাব্দী থেকে শুরু করে পরবর্তী ৫০০ বছর ধরে ওই আধিপত্য বজায় রেখেছিলেন। এই সিদ্ধপুরুষদের সঙ্গে যোগ দিলেন নাথপন্থী সাধক—সাধিকারা। দশম এবং একাদশ শতকে তাঁরাই হয়ে উঠলেন ভারতবর্ষের প্রধান উপাস্য সম্প্রদায়। সিদ্ধ পুরুষদের এবং নাথপন্থীদের ভক্তিবাদ সম্পর্কিত বেশ কিছু রচনা হিন্দির নির্গুণ কাব্যধারাকে পরিপুষ্ট এবং সংশ্লিষ্ট করে।

সিদ্ধপুরুষ নাথপন্থীদের অপভ্রংশ, মিশ্রিত রচনা থেকে হিন্দি নির্গুণ রস— সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে বলে অনেক ভাষাবিদ মনে করেন। আবার অনেকে এই মতবাদকে স্বীকার করতে চান না। এই তালিকায় রাহুল সাংকৃত্যায়ন, হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, পরশুরাম চতুর্বিদী, ডা. ধর্মবীর ভারতীর নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁরা বলেছেন ভারতীয় সমাজে যে নির্গুণ সন্ত কবিদের প্রভাব— প্রতিপত্তি ছিল, তাঁরাই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে হিন্দি নির্গুণ কাব্যধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন।

নির্গুণ কাব্যধারার প্রধান প্রবক্তা হিসাবে আমরা অবশ্যই সন্ত কবীরের নাম করব। তিনি তাঁর বাণীর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের ভাবনাকে উজ্জীবিত করতে পেরেছিলেন। শুধু তাই নয়, কবীর নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে আত্মগৌরব—ভাবের উন্মেষ ঘটান। যে সমস্ত মানুষেরা অবচেতনার অন্ধকারে দিন কাটাতে বাধ্য হতেন তিনি তাঁদের মধ্যে এক নতুন জীবন—দিশার প্রবর্তন করেন। কবীরের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাবে সমাজের একেবারে প্রান্তিক শ্রেণির মানুষরা মূলস্রোতে ফিরে আসার মতো সাহস এবং সামর্থ অর্জন করেছিলেন। এইভাবে কবীর তাঁর সামাজিক কর্তব্য সাধন করেন। তাঁর দোঁহাগুলিকে অনুসরণ করে অনেক প্রান্তিক মানুষ ভক্তিমার্গের উচ্চতম সোপানে পা—রাখার মতো দুঃসাহস অর্জন করেন। কবীর নিজেই এমন একটি নির্গুণপন্থা স্থাপন করেন। অনেককে তিনি প্রভাবিতও করেন। নানা সন্ত কবীরা কবীরের ধারাকে অনুসরণ করতে থাকেন। তাঁরা নির্গুণ, নিরাকার ঈশ্বরের ভজনা করতেন। তাঁদের ভক্তিকে নির্গুণবাদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত বলে গণ্য করা হয়। তাঁরা অবতার এবং মূর্তির পূজাকে অস্বীকার করতেন। বহু দেবদেবীর আরাধনা ত্যাগ করে ঈশ্বরের পূজার বাহ্যিক আচরণকে বর্জন করতেন। তাঁরা নির্গুণ নিরাকার ঈশ্বরকে সাত্ত্বিকভাবে অর্চনা করতেন।

এই সন্ত কবীরা নানা কবিতায় তাঁদের দার্শনিক মতবাদকে প্রকাশ করেন। আচার আচরণের শুদ্ধতার ওপর জোর দিয়েই এই কবিতাগুলি লেখা হয়েছিল। এই কবীরা মানুষের সার্বিক, আত্মিক উন্নয়নের কথা বলতেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন আড়ম্বর এবং অনাবশ্যক কর্মকাণ্ডগুলিকে বর্জন করতে হবে। আত্মগরিমার প্রভাবকে ক্ষুন্ন করতে হবে। তাঁরা নিম্নবর্গের জনগণকে উন্নত করে তোলার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় কাজ করে গেছেন। তাই আমরা সংক্ষেপে তাঁদের সমাজসংস্কারক বা ধর্মসংস্কারক বলতে পারি।

নির্গুণ ধারাতে এমন কিছু কবি ও সন্ত যুক্ত হয়েছেন যাঁরা সহজ প্রেমগাথা লিখে আমাদের সাহিত্যকে আরও উৎকৃষ্ট করে তুলেছেন। এইসব সাধক কবীরা লৌকিক প্রেমের প্রেক্ষাপটে যে প্রেমতত্ত্বের আভাস দিয়েছেন সেখানে প্রিয়তম ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের মিলনবাসনা পরিস্ফুটিত হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলে এবং মগধ প্রদেশের বংশ—পরম্পরাগতভাবে প্রচলিত প্রেমকাহিনি গুলির কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে

পারে। এই কাহিনিগুলি অবশ্য অনেকসময়ে বাস্তবতাকে বর্জন করেছে। অনেক সময়ে আশ্রয়দাতা রাজা বা সম্রাটের প্রশংসা করেছে। তা সত্ত্বেও এই কাহিনিগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

এইভাবে নির্গুণ কাব্যধারা নিজেকে নানা দিকে পরিব্যাপ্ত করল। সুফীদের অধ্যাত্ম—রহস্যবাদের পাশাপাশি মানব—মানবীর চিরন্তন প্রেম এবং ভালোবাসার উৎস অন্বেষণ করা— কত বিচিত্র পথেই এই ধারা প্রবাহিত হয়েছে!

নির্গুণ ধারায় ভক্তি—দর্শনের যে রূপ পরিস্ফুটিত হয়েছে সেই বিষয়টিও আলোচনা করা উচিত। নির্গুণ ভক্তি—সাহিত্যের অধ্যয়নকারীরা নির্গুণ সন্ত কবিদের রচনায় ইসলামের একেশ্বরবাদের সন্ধান করেছেন। এর পাশাপাশি তাঁরা বৌদ্ধদের শূন্যবাদকেও প্রাধান্য দিয়েছেন। কথাপ্রসঙ্গে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদের আলোচনা করেছেন। শৈবদের অদ্বৈতবাদ অথবা রামানন্দীয় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের কথা প্রমুখ নির্গুণ সন্ত কবিদের রচনায় শোনা গেছে। সুফীদের প্রেম—সাধনার মধ্যে যে রহস্য লুকিয়ে আছে তা অন্বেষণ করেছেন কবীর এবং অন্যান্য সাধক কবীরা। বৈষ্ণব ভক্তির অনুরাগবাদ অথবা যোগ প্রতিপালিত হঠযোগ সাধনমার্গ ইত্যাদি তত্ত্বের সন্ধান আছে তাঁদের দোঁহার মধ্যে।

ঈশ্বরীয় সত্তা সম্পর্কে অদ্বৈতবাদে যে কথা বলা হয়েছে তাকে অনেক সন্ত কবি অনুসরণ করেন। আবার সুফী মতে যে একেশ্বরবাদের জয়গান করা হয়েছে, সে—কথাও অনেক কবি বলেছেন। তাই আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, নির্গুণ কাব্যধারার কবীরা অদ্বৈত মতবাদকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। কিন্তু এই অদ্বৈতদর্শন শঙ্করাচার্যের প্রবর্তিত দর্শন থেকে কিছুটা আলাদা। তাই আমরা এই দর্শন বিচার করতে গেলে সুফী মতবাদকেও স্বীকার করব। যদি অদ্বৈত বেদান্ত দ্বারা প্রতিপাদিত অদ্বৈত দৃষ্টিকোণকে সন্ত কাব্যের মেরুদণ্ড বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে স্বীকার করতে হবে সেখানে জ্ঞানমার্গেরও প্রদর্শন আছে। জ্ঞান ছাড়া মোক্ষলাভ হয় না— শঙ্করাচার্যের এই সিদ্ধান্তকে স্বীকার করলে সন্ত কবিদের মতকে জ্ঞানাশ্রিত মত বলে স্বীকৃতি দিতে হয়। কিন্তু যে সকল নির্গুণবাদী ছিলেন শাস্ত্রবিমুখ এবং তথাকথিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে যাঁদের কোনো যোগসূত্র ছিল না তাঁরা কি এইভাবে চিন্তা করতে পারতেন? জ্ঞানার্জনের জন্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করা অনিবার্য বলে এই সন্তরা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে সময় নষ্ট করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁরা সোপার্জিত আধ্যাত্মিক চেতনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এই অনুপ্রেরণা তাঁদের মধ্যে এমন এক উপলব্ধির জন্ম দিয়েছিল যার সাহায্যে তাঁরা সৎ এবং অসৎ বস্তুর বিচার করতে পারতেন। তাই শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদই যে তাঁদের কাব্য রচনার একমাত্র সহায়ক তত্ত্ব একথা বলা উচিত নয়। অদ্বৈতবাদের জ্ঞানমূলক স্বীকৃতিকে সন্তকবীরা সহজভাবে অস্বীকার করেছেন। তাঁদের ঈশ্বরীয় সত্তায় এবং চিন্তায় প্রেম, ভক্তি এবং অন্যান্য মানবিক গুণের বহিঃপ্রকাশ চোখে পড়ে। তাঁরা বিশ্বাস করতেন অনুভূতির বাহ্যজ্ঞানকে। তাঁরা শুধুমাত্র পুঁথি পাঠ করে বিদ্বান হতে চাইতেন না।

নির্গুণ ধারার সন্তরা যে ভক্তি প্রতিপাদন করেছেন তার মূলধারা অন্বেষণ করতে গিয়ে আমরা বিভিন্ন মতবাদের সম্মুখীন হব। ভারতবর্ষের বুকে নানা সম্প্রদায় স্বীয় স্বীয় ধর্ম মতবাদকে কেন্দ্র করে জীবনচর্চা করেছেন। তাঁদের নিজস্ব দার্শনিক মতবাদ ছিল। ছিল উপাসনা পদ্ধতি। কবীর প্রমুখ সন্তদের সময়কার ধার্মিক এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা উচিত। সেই সময়ে সারা দেশে রাজনৈতিক ক্রান্তি দেখা দিয়েছিল এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। শঙ্করাচার্য এবং তাঁর পরবর্তী বৈষ্ণব আচার্যদের প্রভাবে অদ্বৈত—মতবাদের দার্শনিক ক্ষেত্র পরিব্যাপ্ত হয়। শৈব এবং শাক্ত মতাবলম্বীরা তখন আগের থেকে আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। বৌদ্ধ মত তখন ক্রমশ ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু সিদ্ধ এবং নাথ সম্প্রদায়রা তাঁদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বজায় রেখেছেন। দক্ষিণ ভারতের আলবার নামে এক নতুন ভক্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব চোখে পড়েছে। এইভাবে নানা ধরনের ধার্মিক মতবাদ তখন ভারতের জনচিত্তকে আলোড়িত করেছিল।

এরই প্রভাবে নির্গুণ ধারার সন্ত কবিরা নতুন পথের প্রবর্তক হলেন। তাঁরা সগুণ ঈশ্বরের আরাধনার উপদেশ দিলেন। তাঁদের যে জীবন—অন্বেষার কথা আমরা শুনে থাকি তা শুদ্ধ এবং অনাবিল। তাঁরা কোনো একটি নির্দিষ্ট দার্শনিক মতবাদের দ্বারা সেইভাবে প্রভাবিত হননি। বিভিন্ন দর্শনচিন্তার সার্থক রূপায়ন ঘটে গিয়েছিল তাঁদের মতবাদের মধ্যে। সন্তদের ঈশ্বর নির্গুণ নিরাকার এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তার মধ্যে দয়া—দাক্ষিণ্যের অভাব ছিল না। অর্থাৎ এই ঈশ্বরকে তাঁরা পরম দয়ালু হিসাবেই চিহ্নিত করেছিলেন। ব্রহ্মা ঈশ্বর অথবা রামের স্বরূপ সত্বা এবং সর্বশক্তিমান হলেও তিনি কিন্তু কোনো অবতার ছিলেন না। সংসারে তিনি বারবার আগমন করেছেন। মানুষকে ঈশ্বরভক্তির পথে নিয়ে গেছেন। মানুষের জীবনে এনেছেন অকৃপণ ভগবৎকৃপা। সন্তদের ভক্তিসাধনাতে অষ্টাঙ্গ যোগের আধিপত্য আছে, কিন্তু এই যোগ কোনো শাস্ত্রীয় জড়তাতে পরিপূর্ণ নয়। এখানে প্রায়শ্চিত্ত সাধনা, আসন প্রাণায়াম এবং সমাধি করতে হত। আচারনিষ্ঠা এবং মনোনিবেশ ছিল এই জাতীয় যোগ সাধনার প্রধান উদ্দেশ্য। এই যোগ নাথ সম্প্রদায়ের পরম্পরা থেকে আগত। ভক্তির সঙ্গে তাকে সমন্বিত করা হয়েছিল। এই যোগসাধনাকে সফল করার জন্য কুণ্ডলিনী—যোগের প্রচলন ছিল। প্রসঙ্গত আমরা চক্রকমল, মুদ্রা, ধ্যান, সুরতি, নিরতির কথা বলব।

সন্ত কবিরা আবার বৈষ্ণব রস—সাহিত্যের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন। এখানে অদ্বৈতভাব এবং ভক্তিভাব পাশাপাশি বহমান ছিল। বিষ্ণুর উপাসক অথবা অবতাররূপী ঈশ্বরের উপাসক পাশাপাশি বসে ঈশ্বরের আরাধনা করতেন। যদিও কবীর বৈষ্ণবজনদের রামের সমক্ষে রেখে বলেছিলেন—

মেরো সঙ্গী দোঈ জনাঁ,
এক বৈষ্ণোঁ এক রাম।
ও হৈঁ দাতা মুকতিকা,
ও সুমিরাওয়ে নাম।।

অর্থাৎ আমার সঙ্গী দুজন, একজন বিষ্ণু এবং অন্যজন রাম। তাঁরাই মুক্তিদাতা এবং তাঁরাই স্মরণযোগ্য নাম।

এই দোঁহাটি পাঠ করলে আমরা বুঝতে পারি কবীর রাম এবং বিষ্ণুকে একইভাবে শ্রদ্ধা এবং ভক্তি প্রদর্শন করেছেন। তাঁর চোখে রাম এবং বিষ্ণুর মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না।